খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের ব্যাখ্যা
অথবা এর প্রয়োজনীয় দলিলসমূহ

হিযবুত তাহ্‌রীর

সূচীপত্র

ধারা ১: ইসলামী আক্বীদাহ্ হলো রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি

ধারা ২: দার আল-ইসলাম হচ্ছে সেই অঞ্চল যেখানে ইসলামের আইনসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়

ধারা ৩: খলীফা সুনির্দিষ্ট শারীআহ্ বিধিসমূহ গ্রহণ করবেন

ধারা ৪: ব্যক্তিগত ইবাদত ও আক্বীদাহ সম্পর্কিত কোন বিষয়ে খলীফা সুনির্দিষ্ট মত গ্রহণ করবেন না

ধারা ৫: ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিক শরীয়াহ্ প্রদত্ত অধিকার ভোগ করবে এবং নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে

ধারা ৬: রাষ্ট্রকে তার শাসনকার্যে, বিচার-ফয়সালা ও অনুরূপক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমান আচরন করতে হবে

ধারা ৭: মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য না করে রাষ্ট্র নাগরিকদের উপর শরীয়াহ্ বাস্তবায়ন করবে

ধারা ৮: বিশেষভাবে আরবী হচ্ছে ইসলামের ভাষা এবং আরবীই হবে রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবহৃত একমাত্র ভাষা

ধারা ৯: ইজতিহাদ ফরযে কিফায়াহ্ এবং যোগ্যতা থাকলে যেকোন মুসলিমের ইজতিহাদ করার অধিকার রয়েছে

ধারা ১০: সকল মুসলিমের ইসলামের দায়িত্ব বহন করা উচিত এবং ইসলামে যাজক শ্রেণী বলে কোনকিছু নেই

ধারা ১১: রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামের দাওয়াহ্ (ইসলামের প্রতি আহ্বান) বহন করা

ধারা ১২: শুধুমাত্র *কুর'আন*, *সুন্নাহ্*, সাহাবাদের *ইজ্‌মা* এবং *ক্বিয়াস*কেই দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়

ধারা ১৩: প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নির্দোষ, আদালতের রায় ছাড়া কোন শাস্তি না। নির্যাতন নিষিদ্ধ; শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ধারা ১৪: সকল কাজ *শারীয়াহ্* দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাজের পূর্বে *শারীয়াহ্* হুকুম জানা থাকতেই হবে, তবে বস্তু মৌলিকভাবে মুবাহ।

ধারা ১৫: কোন মাধ্যম হারাম কাজে ধাবিত বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হারামে ধাবিত করলে, তবে তা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

ধারা ১৬: শাসনব্যবস্থা একক, যুক্তরাষ্ট্রীয় নয়

ধারা ১৭: শাসন কেন্দ্রীয় এবং প্রশাসন বিকেন্দ্রীয়

ধারা ১৮: শাসক (শুধুমাত্র) চার ধরনের: খলীফা, মুআউইন, ওয়ালী এবং 'আমিল, এবং যার উপর একই হুকুম প্রযোজ্য হয়।

ধারা ১৯: শাসনের দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা (শুধুমাত্র) মুসলিম, পুরুষ, মুক্ত, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক, ন্যায়পরায়ন ও সক্ষম ব্যক্তির

সাধারণ বিধিসমূহ

ধারা ১

ইসলামী আক্বীদাহ্ হলো রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। সুতরাং, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, কাঠামো, জবাবদিহিতা কিংবা রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত অন্য কোন বিষয়, যা কিনা ইসলামী আক্বীদাহ্ হতে উৎসারিত নয়, তা রাষ্ট্রে বিরাজ করতে পারবে না। একই সময়ে, ইসলামী আক্বীদাহ্ রাষ্ট্রের সংবিধান এবং আইন-কানুনের ভিত্তি হিসেবেও কাজ করবে; তাই, সংবিধান এবং আইন-কানুনের সাথে সম্পর্কিত এমন কোন বিষয়ও রাষ্ট্রে বিরাজ করতে পারবে না, যা কিনা ইসলামী আক্বীদাহ্ হতে উদ্ভূত নয়।

দলিলসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা

কোন একটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে কিছু নতুন চিন্তার আবির্ভাবের ফলে, যার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নতুন চিন্তার আবির্ভাবের দরুণ শাসনক্ষমতারও (জনগণের বিষয়াদি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করার নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষ) পরিবর্তন ঘটে, কেননা এই চিন্তাগুলো দৃঢ়বিশ্বাসে পরিণত হওয়ায় তা মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে। এই দৃঢ় চিন্তাগুলোর উপর ভিত্তি করেই মানুষের কর্মকান্ড বিকশিত হতে থাকে। এভাবে জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হতে থাকে, যার ফলে তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হয়। সরকার হচ্ছে এমন কর্তৃপক্ষ যে জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের অভিভাবক এবং এগুলোর তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত। ফলে, রাষ্ট্র বিকশিত হয় এবং সরকারব্যবস্থা গড়ে উঠে ঐ ভিত্তিকে কেন্দ্র করে, যে ভিত্তির উপর জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠে। বলাবাহুল্য, জীবন সম্পর্কে নির্দিষ্ট একটি চিন্তার উপর ভিত্তি করেই জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠে। তাই, মূলত এ চিন্তাটিই রাষ্ট্র এবং সরকারব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

যেহেতু একগুচ্ছ চিন্তা, মাপকাঠি এবং দৃঢ় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী বিকশিত হয়, তাই এগুলোকেই ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এগুলোর উপর ভিত্তি করেই সরকার জনগণের বিষয়াদি পরিচালনা করে এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করে। সে কারণে, কোন একটি একক চিন্তার পরিবর্তে একগুচ্ছ চিন্তাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই একগুচ্ছ চিন্তার পরিপূর্ণ প্রভাব জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটায়, যার ধারাবাহিকতায় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের প্রতিও একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠে এবং যার ভিত্তিতে এগুলোর (স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের) ব্যবস্থাপনার জন্য শাসনকর্তৃত্বও নির্ধারিত হয়। সুতরাং, রাষ্ট্রের সংজ্ঞা হচ্ছে কোন একটি জনগোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত একগুচ্ছ চিন্তা, মাপকাঠি এবং দৃঢ় বিশ্বাস বাস্তবায়নকারী একটি নির্বাহী প্রতিষ্ঠান।

এটি হচ্ছে রাষ্ট্র সম্পর্কিত, যা রাষ্ট্রের সংজ্ঞা থেকে নিরূপিত, অর্থাৎ যা জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ তদারকি করে এবং তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

বলাবাহুল্য, এই একগুচ্ছ চিন্তা যার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ একগুচ্ছ চিন্তা, মাপকাঠি এবং দৃঢ় বিশ্বাস একটি মৌলিক চিন্তা থেকে উৎসারিত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। যদি রাষ্ট্র একটি মৌলিক চিন্তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এটি মজবুত ভিত্তি এবং দৃঢ় কাঠামো সম্পন্ন হবে, কেননা এটি মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর কারণ হচ্ছে মৌলিক চিন্তা এমন একটি চিন্তা যা অন্য কোন চিন্তা হতে উদ্ভূত নয়, বরং এটা নিজেই একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আক্বীদাহ্। ফলে এক্ষেত্রে বলা যাবে যে, রাষ্ট্র একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আক্বীদাহ্'র উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে, রাষ্ট্র যদি কোন মৌলিক চিন্তার উপর ভিত্তি করে গড়ে না উঠে, তবে খুব সহজেই এর পতন সাধিত হবে এবং এর কর্তৃত্ব ও অস্তিত্ব উপড়ে ফেলা খুব কঠিন কিছু হবেনা। কারণ এটি কোন বুদ্ধিবৃত্তিক আক্বীদাহ্'র উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই রাষ্ট্রের শক্তিশালী উপস্থিতির জন্য প্রয়োজন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আক্বীদাহ্'র উপর ভিত্তি করে একে প্রতিষ্ঠিত করা, যে আক্বীদাহ্ হতে রাষ্ট্র সম্পর্কিত অন্যান্য চিন্তাসমূহ উৎসারিত হবে। অর্থাৎ এটি এমন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আক্বীদাহ, যা হতে জীবন সম্পর্কে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয় এমন একগুচ্ছ চিন্তা, মাপকাঠি এবং দৃঢ়বিশ্বাসের উন্মেষ ঘটবে, এবং যার ধারাবাহিকতায় জীবনের প্রতি রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী জন্ম নিবে, যা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের মানদন্ড নির্ধারণ করবে।

শুধুমাত্র ইসলামী আক্বীদাহ্'র উপর ভিত্তি করেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, কেননা যে চিন্তা, মাপকাঠি এবং দৃঢ়বিশ্বাস উম্মাহ্ (মুসলিমদের সমষ্টি) নিজের মাঝে ধারণ করেছে সেগুলো একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আক্বীদাহ্ হতে উৎসারিত। প্রথমত, উম্মাহ্ এ আক্বীদাহ্'কে গ্রহণ করেছে এবং সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে এটিকেই একমাত্র সত্য আক্বীদাহ্ হিসেবে আলিঙ্গন করেছে। তাই, এ আক্বীদাহ্ হতেই সে (উম্মাহ্) জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক চিন্তা গ্রহণ করেছে, এবং এরই ভিত্তিতে জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে এবং ঐ সমস্ত বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে যাকে এই আক্বীদাহ্ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। এ আক্বীদাহ্ হতে উৎসারিত জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন চিন্তা, মাপকাঠি এবং দৃঢ়বিশ্বাসসমূহকেও উম্মাহ্ গ্রহণ করেছে। আর তাই ইসলামী আক্বীদাহ্ ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি।

উপরন্তু রাসূল (সাঃ) একটি নির্দিষ্ট ভিত্তির উপর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাই সকল যুগে, সকল স্থানের জন্যই ইসলামী রাষ্ট্র এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আহ্কাম সম্পর্কিত আয়াত নাযিল না হওয়া সত্ত্বেও, মদীনার কর্তৃত্ব গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই রাসূল (সাঃ) একে ইসলামী আক্বীদাহ্'র উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলিমদের জীবনধারণ, পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়াদি, বিভিন্ন দূর্দশা অপসারণ এবং পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদ নিরসণের ভিত্তি হিসেবে **'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্'র প্রেরিত রাসূল'** এই সাক্ষ্যকে মানদন্ড হিসেবে প্রতিস্থাপন করেন। অন্য কথায়, জীবনের সকল বিষয়, সরকারব্যবস্থা, এবং শাসন কর্তৃত্বের ভিত্তি হিসেবে একে গ্রহণ করা হয়। তিনি (সাঃ) এখানেই ক্ষান্ত হননি, বরং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জিহাদের আহ্কাম নাযিলের মাধ্যমে এই আক্বীদাহ্-কে অন্য

জাতির মাঝে ছড়িয়ে দিতে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) হতে আবু দাউদ বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন: **"আমি (আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে) আদিষ্ট হয়েছি যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে থাকি যতক্ষণ না তারা 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্'র প্রেরিত রাসূল' এ কথার স্বীকৃতি দেয়। যদি তারা তা করে, তবে তাদের জীবন ও সম্পদ আমার কাছ থেকে নিরাপদ, তবে যেটা আল্লাহ্'র আইন (অর্থাৎ শারীআহ্ লঙ্ঘনে প্রাপ্য শাস্তি) তা ব্যতীত। আর তাদের হিসাব নিকাশ আল্লাহ্'র কাছে।"** [সর্বজনগৃহীত; বুখারী হতে বর্ণিত]

এছাড়াও, রাসূল (সাঃ) রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে আক্বীদাহ্'র সার্বক্ষণিক উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে মুসলিমদের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন। তিনি মুসলিমদেরকে তলোয়ার শাণিত করার নির্দেশ প্রদান করেছেন, যাতে করে শাসনক্ষমতায় কুফর স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলে অর্থাৎ কর্তৃত্ব এবং আইনের উৎস হতে যদি আক্বীদাহ অপসারিত হয়ে পড়ে, তবে যেন তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া যায়। রাসূল (সাঃ)-এর উক্তি "সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসক" তথা যালিম শাসকদের ব্যাপারে সাহাবাগণ (রা.) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, **"আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার উত্তোলন করবো না?"** তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন, **"না, যতক্ষন পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম রাখে।"** [মুসলিম]; তিনি শাসকের প্রতি জনগণের আনুগত্যের বিষয়টি অর্থাৎ বাই'য়াতের (শাসকের প্রতি আনুগত্যের শপথ) বৈধতা সম্পর্কিত করেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না শাসক হতে সুস্পষ্ট কুফর পরিলক্ষিত হয়। নিকৃষ্ট শাসকদের ব্যাপারে আউফ বিন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা হতে পাওয়া যায়, **"রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার উত্তোলন করব না?"** তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন, **"না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সালাত কায়েম রাখে।"** [মুসলিম]; বাইয়াত বিষয়ে উবাদা বিন আস সামিত (রাঃ)-এর বর্ণনা হতে পাওয়া যায়, **"... এবং আমরা কর্তৃত্বশীলদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না কুফরের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়"**, এবং তাবারানীর বর্ণনায় শব্দগুলো এভাবে এসেছে, **"সুস্পষ্ট কুফর"**। ইবনে হিব্বানের সহীহ্ বর্ণনায় বলা হয়েছে, **"যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্'র প্রতি অবাধ্যতা সুস্পষ্ট হয়"**। এই সবকিছু হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে হবে ইসলামী আক্বীদাহ্। যেহেতু, রাসূল (সাঃ) নিজে এর উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এবং এর সুরক্ষায় তলোয়ার শাণিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এর প্রসারে জিহাদের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

পূর্বে বর্ণিত নীতিমালার অনুসরণে খসড়া সংবিধানের প্রথম ধারাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ধারাটি রাষ্ট্রকে এমন কোন চিন্তা, দৃঢ়বিশ্বাস কিংবা মাপকাঠিকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে, যা ইসলামী আক্বীদাহ্ হতে উৎসারিত নয়। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী আক্বীদাহ্'কে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলেই চলবেনা, বরং রাষ্ট্রের যেকোন গুরুত্বপূর্ণ কিংবা গুরুত্বহীন বিষয়াদির ক্ষেত্রেও আক্বীদাহ্'র প্রতিফলন থাকতে হবে। তাই, রাষ্ট্রের পক্ষে জীবন বা শাসন সম্পর্কিত এমন কোন মতবাদ গ্রহণ নিষিদ্ধ যা ইসলামী আক্বীদাহ্ হতে উদ্ভূত নয়, কিংবা যার উদ্ভব ঘটেছে ইসলামী আক্বীদাহ্'র সাথে সাংঘর্ষিক অন্য কোন আক্বীদাহ্ হতে। ইসলামী আক্বীদাহ্ হতে উদ্ভূত নয়, এমন যেকোন মতবাদ ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যাখ্যান করবে। সে কারণে, ইসলামী রাষ্ট্র, গণতন্ত্রকে মেনে নিবে না, যেহেতু এটি ইসলামী আক্বীদা হতে উদ্ভূত হয়নি এবং এই আক্বীদাহ্ হতে উদ্ভূত অন্যান্য চিন্তার সাথে সাংঘর্ষিক। একইভাবে, ইসলামী রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করবেনা কারণ এটি ইসলামী আক্বীদাহ্ হতে আসেনি, বরং ইসলামী আক্বিদাহ্ হতে উৎসারিত চিন্তাসমূহ একে প্রত্যাখ্যান করেছে, এর অনুমোদন নিষিদ্ধ করেছে এবং এর বিপজ্জনক পরিণতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছে। একইভাবে, দেশপ্রেমের মত চিন্তারও কোন অস্তিত্ব থাকবেনা, যা ইসলামী আক্বীদাহ্ হতে উদ্ভূত নয় এবং এর সাথে সাংঘর্ষিক। একইভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন কাঠামোতে গণতন্ত্রের অনুকরণে কোন মন্ত্রী পরিষদ থাকবেনা, এবং এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সাম্রাজ্যবাদী, রাজতান্ত্রিক কিংবা প্রজাতান্ত্রিক কোন মতবাদের উপর ভিত্তি করেও গড়ে উঠবেনা। কেননা এগুলোর কোনটাই ইসলামী আক্বীদাহ হতে উদ্ভূত নয়, বরং এর সাথে সাংঘর্ষিক। উপরন্তু, ইসলামী আক্বীদাহ্ বহির্ভূত কোন মতবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা যেকোন ব্যক্তি, দল বা আন্দোলনের জন্য নিষিদ্ধ। তাই, এই ধরনের যেকোন জবাবদিহিতা নিষিদ্ধ এবং অনুরূপভাবে ইসলামী আক্বীদাহ্ বহির্ভূত মতবাদের ভিত্তিতে কোন দল বা আন্দোলন গড়ে উঠাও নিষিদ্ধ। বাস্তবতা হচ্ছে ইসলামী আক্বীদাহ্ রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, যা রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের আবদ্ধ রাখে। কারণ, এর রাষ্ট্রীয় সত্ত্বা এবং পাশাপাশি তা হতে উৎসারিত হিসেবে জীবনের সকল বিষয়, এবং রাষ্ট্রীয় সত্ত্বা হিসেবে এর সম্পর্কিত সকল কর্মকান্ড, এবং রাষ্ট্রীয় সত্ত্বা হিসেবে এর বিভিন্ন সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি হতে হবে এর আক্বীদাহ্, অর্থাৎ ইসলামী আক্বীদাহ্।

ধারার ২য় অংশ এ সত্য হতে গৃহীত যে, সংবিধানই হচ্ছে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালা (কানুন আল আসাসি), এভাবে এটি নিজেই একটি আইন, আর আইন হচ্ছে কর্তৃপক্ষের জারিকৃত বিধান। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা কিছু তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর উপর নাযিল করেছেন, তা দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করতে শাসককে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি ঐ সমস্ত শাসককে কাফির আখ্যায়িত করেছেন, যারা আল্লাহ্'র নাযিলকৃত বিধানকে অপরিপূর্ণ, অযোগ্য মনে করে এবং নিজের বিধানকে উপযুক্ত মনে করে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ সকল শাসককে 'আসি' (অবাধ্য) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যারা আল্লাহ্'র বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে, কিন্তু ঐ বিধানকে উপযুক্ত মনে করে না। এ থেকে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শাসকের জারিকৃত বিধান, তথা যেকোন আইন এবং সংবিধান অবশ্যই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই হতে হবে। আল্লাহ্'র কিতাব এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ্ হতে শাসককে শারী'আহ্ আইন দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনার নির্দেশ সুস্পষ্ট। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

"কিন্তু না, তোমার রব-এর শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবেনা, যতক্ষণ তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে।" [সূরা আন-নিসাঃ ৬৫]

এবং

وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

"আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করুন।" [সূরা আল-মা'য়ীদাহ্ঃ ৪৯]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নাযিলকৃত বিধান বহির্ভূত অন্য কোন আইন দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে সতর্ক করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ণের ক্ষমতাকে তাঁর বিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী শাসন করেনা, তারা কাফির।" [সূরা আল-মা'য়ীদাহ্ঃ ৪৪]

এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, **"যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু প্রবর্তন করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"** [বুখারী]; সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে: **"এমন কিছু যা আমাদের দ্বীনের নির্দেশ বহির্ভূত"**, এবং ইবনে হাজমের *আল-মুহাল্লা* এবং ইবনে আবদ আল-বার-এর *আল-তামহীদ*-এর বর্ণনায় এসেছে: **"এমন প্রত্যেকটি কাজ যা আমাদের নির্দেশের ভিত্তিতে নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"** এগুলো থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আইন অবশ্যই ইসলামী আক্বীদাহ্ হতে উদ্ভূত হতে হবে; এগুলোই হচ্ছে শারী'আহ্ আইন, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূল-এর উপর নাযিল করেছেন বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, হোক এই নাযিলকৃত বাণীর অর্থ পরিষ্কারভাবে বর্ণিত (explicit); যেগুলোকে কুর'আন, সুন্নাহ্ এবং সাহাবা (রা.)-দের ইজমা-এর মধ্যে প্রতিফলিত আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত হুকুম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে; অথবা হোক এই নাযিলকৃত বাণীর অর্থ পরোক্ষভাবে বর্ণিত (implicit); যেগুলোকে শারী'আহ্ প্রদত্ত ইল্লাহ্ (reason)-এর সাথে কিয়াস্ করে পাওয়া যায় এবং এগুলোকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত হুকুমের ইঙ্গিত বহনকারী হুকুম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্যই ধারাটির ২য় অংশকে খসড়ায় স্থান দেয়া হয়েছে।

সেইসাথে, বান্দার যেকোন কাজ যেহেতু তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) নির্দেশে পরিচালিত হতে বাধ্য, তাই তাদের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থাপনাও আল্লাহ্'র নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হতে বাধ্য। ইসলামী শারী'আহ্ নাযিল করা হয়েছে মানুষের সকল সম্পর্ক পরিচালনা করার জন্য, এ সম্পর্ক হতে পারে স্রষ্টার সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক কিংবা ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্ক। শারী'আহ্ আইনের বাধ্যবাধকতার দরুণ, নিজেদের বিষয়াদি যথেচ্ছভাবে পরিচালনা করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"...রাসূল তোমাদেরকে যা আদেশ করেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।" [সূরা আল-হাশরঃ ৭]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন তখন কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিনা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন অধিকার থাকবে না।" [সূরা আল-আহযাবঃ ৩৬]

রাসূল (সাঃ) বলেছেন: **"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কিছু বিষয়কে ফরয (অবশ্যই পালনীয়) করেছেন, সুতরাং সেগুলোকে অবহেলা করো না; এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কিছু বিষয়কে হারাম (অবশ্যই বর্জনীয়), সুতরাং সেগুলো লঙ্ঘন করো না।"** (আবি ছা'লাবাহ্ হতে আল-দারাকুতনি কর্তৃক সংকলিত, এবং আল-নববী তার *আল-রিয়াদ আল-সালিহিন*-এ এটাকে হাসান হিসেবে নিশ্চিত করেছেন)। তিনি (সাঃ) আরও বলেছেন: **"যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের (ইসলাম) মধ্যে এমন নতুন কিছু প্রবর্তন করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"** [সর্বসম্মত; আয়েশা (রা.) হতে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত]

সুতরাং, এটা সুনিশ্চিত যে, শাসক নয়, বরং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-ই হচ্ছেন আইন প্রণয়নকারী। তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি জনগণ এবং শাসককে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং কর্মকান্ডে তাঁর বিধান মেনে চলতে বাধ্য করেছেন, তাঁর বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং অন্য যেকোন বিধান অনুসরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এ কারণে, জনগণের বিষয়াদি পরিচালনার ক্ষেত্রে মানবরচিত বিধানের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই এবং শাসক কর্তৃক মানবরচিত বিধান পালনে জনগণকে বাধ্য করারও কোন সুযোগ নেই।

ধারা ২

***দার আল-ইসলাম* (ইসলামের আবাসস্থল বা ইসলামী রাষ্ট্র) হচ্ছে সেই অঞ্চল যেখানে ইসলামের আইনসমূহ বাস্তবায়ন করা হয় এবং যেটার নিরাপত্তা ইসলাম কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়। *দার আল-কুফর* (কুফরের আবাসস্থল বা কুফর রাষ্ট্র) হচ্ছে সেই অঞ্চল যেখানে কুফর আইনসমূহ বাস্তবায়িত হয় কিংবা এর নিরাপত্তা ইসলাম ব্যতিত অন্য কিছু দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।**

দার শব্দটির অনেকগুলো অর্থ রয়েছে ঃ

ভাষাগতভাবে: এর অর্থ হচ্ছে "আবাসস্থল", আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বাণীতে শব্দটি এভাবে এসেছে: **"অতঃপর আমি তাকে ও তার বসবাসের স্থানকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম"** (আল-কাসাস ঃ ৮১), এছাড়াও "যাত্রা-বিরতির স্থান" এবং জনগণের বসবাসের জায়গা হিসেবেও এসেছে, যাতে বলা হয়েছে যে মানুষ যেস্থানে বসবাস করে তার প্রতিটিই তাদের *দার*। আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বাণী অনুসারে: **"অনন্তর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করলো এবং তারা সকাল বেলায় গৃহের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।"** (আল-আরাফ ঃ ৯১), এখানে এর অর্থ হচ্ছে, 'শহর'। সিবাওয়েহ্ বলেছেন: "এই *দার* হচ্ছে একটি মনোরম শহর এবং "আবাসস্থল ও স্থান", আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বাণীতে আসা শব্দে: **"এবং মুত্তাকীদের আবাসস্থল (জান্নাত) কতই না চমৎকার হবে"** (আন-নাহল ঃ ৩০)। একইভাবে রূপকঅর্থে এর মানে হচ্ছে "গোত্র", বুখারীতে আবু হামিদ আল-সা'দি কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, **"সত্যই, বনু নাজ্জার হচ্ছে আনসারদের মধ্য হতে সর্বোত্তম গোত্র (*দার*)..."**

এবং *দার* শব্দটি কোন কিছুর নামের সাথেও যুক্ত হতে পারে, আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বাণীতে আসা শব্দে: **"আমি তোমাদেরকে ফাসেকদের আবাসস্থল দেখাবো"** (আল-আরাফ ঃ ১৪৫), **"এবং মুত্তাকীদের আবাসস্থল (জান্নাত) কতই না চমৎকার হবে"** (আন-নাহল ঃ ৩০), **"কিন্তু তারা তাকে হত্যা করল। সুতরাং সালেহ্ বললেন - তোমরা নিজেদের গৃহে তিনটি দিন উপভোগ করে নাও। ইহা এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না"** (হুদ ঃ ৬৫), এবং **"এবং তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন যেখানে তোমরা অভিযান করনি"** (আল-আহ্যাব ঃ ২৭)। এবং একইভাবে মুসলিমে বুরাইদাহ্ কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"...অতঃপর তাদেরকে তাদের পরিবার-পরিজন ছেড়ে মুহাজিরদের আবাসস্থলে গমনের আহ্বান জানান"** এবং আহ্মদে সালিমা বিন নওফেল কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"বিশ্বাসীদের আবাসস্থলের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আস-শাম"**।

এবং এটা শব্দার্থের সাথেও যুক্ত হতে পারে, আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বাণীতে আসা শব্দ অনুসারে **"এবং স্বজাতিকে ধ্বংসের গৃহে বসবাসের সম্মুখিন করেছে"** (ইবরাহিম ঃ ২৮) এবং **"যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন যা চিরকাল থাকবে"** (ফাতির ঃ ৩৫)। এবং আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস, হাসান সহীহ্ সনদ সহকারে ইবনে আসাকির্ হতে এবং তিরমিযী শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে বলেছেন: **"আল্লাহ্ আবু বকরকে ক্ষমা করুন, সে আমার সাথে তার কন্যার বিবাহ দিয়েছে এবং আমাকে হিজরতের স্থানে (*দার আল-হিজরাহ্*) সাথে করে নিয়ে গেছে"**। দারাকুটনিতে ইব্নে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"যদি একজন দাস তার মনিবের পুর্বে শিরকের আবাসস্থল ত্যাগ করে তবে সে মুক্ত এবং যদি সে তার পরে ত্যাগ করে তাহলে সে তার মনিবের কাছে ফেরত যাবে, এবং যদি একজন নারী তার স্বামীর পুর্বে শিরকের আবাসস্থল ত্যাগ করে তবে সে যাকে ইচ্ছা তাকে বিয়ে করতে পারবে এবং যদি সে তার স্বামীর পরে ত্যাগ করে তবে সে তার স্বামীর কাছে ফেরত যাবে"**।

এবং, শারী'আহ্ অর্থের দিক দিয়ে দু'টি শব্দের সাথে *দার* শব্দটিকে যুক্ত করেছে - ইসলাম এবং শিরক। পূর্বে উল্লেখিত সালিমা বিন নওফিল কর্তৃক বর্ণিত মুসনাদ আল-সামিয়্যিনের হাদিসটির আরেকটি বর্ণনা তাবারানির কাছে রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে: **"আস-শাম হচ্ছে ইসলামের আবাসস্থলের কেন্দ্রবিন্দু"**। সুতরাং এখানে *দার* শব্দটি ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং একইভাবে আল-আহ্কাম আল-সুলতানিয়াহ্তে ও আল-হাওই আল-কবিরে আল-মাওয়ার্দি কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"ইসলামের আবাসস্থলে এর সবকিছুই নিষিদ্ধ এবং শিরকের আবাসস্থলে এর সবকিছুই অনুমোদিত"** - সবকিছু বলতে এখানে শারীআহ্ লঙ্ঘনে প্রাপ্য শাস্তি ব্যতিত ইসলামের আবাসস্থলে রক্ত এবং সম্পদের পবিত্রতাকে নির্দেশ করা হয়েছে এবং শারী'আহ্'র সুনির্দিষ্ট আইন মোতাবেক যুদ্ধ ও যুদ্ধলব্ধ মালামালের বিধান অনুসারে, যুদ্ধ চলাকালীন

পরিস্থিতিতে শিরকের আবাসস্থলে (*"দার আল-হারব্"*-যে দেশের সাথে যুদ্ধ চলমান রয়েছে) রক্ত এবং সম্পদের পবিত্রতার অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করা হয়েছে। এই বিভক্তিটি সমগ্র দুনিয়াব্যাপী পরিব্যাপ্ত, সুতরাং দুনিয়াতে এমন কোন স্থান নেই যেটা ইসলামের আবাসস্থল *(দার আল-ইসলাম)* কিংবা শিরকের আবাসস্থল বা ভিন্নার্থে কুফরের আবাসস্থল বা যুদ্ধের আবাসস্থলের *(দার আল-শিরক, দার আল-কুফর, দার আল-হারব্)* বাহিরে থাকতে পারে।

দুটি শর্ত পূরণ করলে কোন স্থানকে *দার আল-ইসলাম* হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকেঃ

প্রথমত: উক্ত স্থানের নিরাপত্তা মুসলিমগণ নিশ্চিত করবে, এর প্রমাণ আমরা রাসূলুল্লাহ্'র (সাঃ) হাদিস থেকে পেয়ে থাকি; এতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কাতে তাঁর সাহাবাদেরকে (রাঃ) বলেছেন: **"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভাই এবং আবাসস্থলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যাতে তোমরা এর মধ্যে নিরাপদে থাকতে পার"**। এই স্থানটি *দার আল-হিজরাহ্*, যা ইবনে আসাকিরে আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে ইতোমধ্যেই উল্লেখিত এবং বুখারীতে আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থানকে দেখানো হয়েছে"**। এবং এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ) ততক্ষণ পর্যন্ত মদীনাতে হিজরত করেননি যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি (সাঃ) সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন; আল-হাফিজ আল-ফাত-এ বলেছেন, আল-শাবি হতে শক্তিশালী সনদের মাধ্যমে বাইহাকি বর্ণনা করেছেন এবং আল-তাবারানি এটাকে সংযুক্ত করেছেন আবু মুসা আনসারির বর্ণনার সাথে, যিনি বলেছেন: **"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল-আকাবাতে আনসারদের মধ্য হতে ৭০ জনের সাথে কথা বলার জন্য তাঁর (সাঃ) চাচা আব্বাসকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হন এবং আবু উমামা (আসাদ বিন যুরারা) তাঁকে বলেছিলেনঃ হে মুহাম্মদ, আপনার প্রভুর জন্য ও নিজের জন্য যা খুশি চান, অতঃপর তিনি (সাঃ) আমাদেরকে আমাদের পুরষ্কার সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি (সাঃ) বলেছিলেনঃ আমি আমার রবের জন্য এটা চাচ্ছি যে, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, এবং আমি নিজের জন্য ও আমার সাথীদের জন্য এটা চাচ্ছি যে, তোমরা আমাদেরকে তোমাদের অন্তর্ভূক্ত করে নেবে, আমাদেরকে সহায়তা করবে এবং আমাদেরকে নিরাপত্তা দেবে, যেরকমভাবে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করে থাক। এর উত্তরে তারা বলেছিলঃ এর বিনিময়ে আমরা কি পাবো? তিনি (সাঃ) বলেছিলেনঃ জান্নাত। তারা বলেছিলঃ আপনি যা চেয়েছেন আমরা তা দিতে প্রস্তুত রয়েছি"**।

এবং সহীহ্ সনদের মাধ্যমে ক্বাব বিন মালিক হতে আহ্মদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটিও এর প্রমাণ, হাদিসটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"তোমরা প্রতিশ্রুতি দাও যে, তোমরা যেভাবে তোমাদের নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা দাও সেভাবে আমাকে নিরাপত্তা দেবে, অতঃপর আল-বারা বিন মারুর তাঁর (সাঃ) হাত ধরলেন এবং বললেনঃ আপনাকে যিনি সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর নামে শপথ করে বলছি, যেভাবে আমরা আমাদের লোকদের নিরাপত্তা দেই সেভাবে আপনাকে নিরাপত্তা দেবো এবং হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ), আমরা যোদ্ধা জাতি এবং সাহসী চরিত্রের অধিকারী যা আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।"** এবং যাবের হতে আহ্মদ কর্তৃক একটি সহীহ বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আকাবার বায়'আতে বলেছেন: **"...যখন আমি তোমাদের কাছে আসব তখন তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে, তোমাদের স্ত্রীদেরকে ও তোমাদের সন্তানদেরকে যেভাবে নিরাপত্তা দাও সেভাবে আমাকে সহযোগিতা ও নিরাপত্তা প্রদান করবে"**। এবং শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য সনদসহ আল-বাইহাকি কর্তৃক সংকলিত দালাইল আল-নাবুওয়াতে উল্লেখ আছে যে, উবাদাহ্ বিন সামিত বলেছেন: **"আমরা আমাদের নিজেদেরকে, আমাদের স্ত্রীদেরকে ও সন্তানদেরকে যেসব থেকে নিরাপত্তা দেই, রাসূলুল্লাহ্কেও (সাঃ) সেসব থেকে নিরাপত্তা দেবো এবং এর বিনিময়ে আমরা জান্নাত লাভ করবো"**।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এমন কোন স্থানে হিজরত করতে রাজি হননি যেটার নিরাপত্তা, ক্ষমতা এবং সুরক্ষার সক্ষমতা ছিল না। আলী (রাঃ) হতে হাসান সনদ সহকারে আল-বাইহাকি কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বনু শায়বান বিন থালাবাহ্ গোত্রকে বলেছিলেন: **"তোমরা মন্দভাবে জবাব দাওনি কারন তোমরা সত্য কথা বলেছ, কিন্তু আল্লাহ্র দ্বীনকে যারা সকল দিক দিয়ে সুরক্ষা দিতে পারে তারা ব্যতিত অন্য কেউ একে নুসরাহ্ দিতে পারে না"**। যখন তারা পারস্য ব্যতিত সমস্ত আরবদের থেকে নুসরাহ্ (নিরাপত্তা, সুরক্ষা) দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একথা বলেছিলেন।

দ্বিতীয়ত: যেখানে ইসলামের আইন-কানুন বাস্তবায়ন করা হয়। বুখারীতে উবাদাহ্ বিন সামিতের বর্ণনা হতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়, এতে তিনি বলেছেন: **"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে ডেকেছিলেন এবং আমরা তাঁকে (সাঃ) আনুগত্যের শপথ প্রদান করেছিলাম। যেসব বিধি-বিধানের মাধ্যমে**

তিনি আমাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ আমাদের আনন্দে ও বেদনায়, কষ্টে ও সমৃদ্ধিতে শোনা ও মান্য করা (আমিরের নির্দেশ), এমনকি কাউকে যদি আমাদের চেয়ে পছন্দে অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং আইনসঙ্গতভাবে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয় তবে কোনরূপ বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবে না, এর ব্যত্যয় হতে পারে শুধুমাত্র যদি তোমরা পরিষ্কার কুফর দেখতে পাও, যা আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে আগত বিধান দ্বারা প্রমাণিত"। এবং আল্লাহ্'র রাসূলকে (সাঃ) শোনা ও মান্য করার বিষয়টি তাঁর (সাঃ) আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে আইনকানুনসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। আহ্মদের বর্ণনা এর আরেকটি প্রমাণ, ইবনে হিব্বান তার সহীহ্ সংগ্রহে ও আবু উবায়েদ আল আমওয়ালে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমরু কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"হিজরত দুই ধরনের - কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাসকারীর হিজরত ও যাযাবরের হিজরত, যাযাবরের ক্ষেত্রে তাকে আদেশ দেয়া হলে মান্য করে এবং ডাকে সাড়া দেয়, কিন্তু কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাকে অধিকতর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং পুরষ্কারের পরিমানও অধিক হয়ে থাকে"**। রাসূল (সাঃ)-এর বক্তব্য থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিষ্কার: **"আদেশ করা হলে সে মান্য করে এবং ডাকলে সাড়া দেয়"**; যেহেতু মরুভুমি ইসলামের আবাসস্থলের *(দার আল-ইসলাম)* অন্তর্ভূক্ত ছিল, যদিওবা এটা হিজরতের *(দার আল-হিজরাহ্)* স্থান ছিল না। এবং একইভাবে আল-তাবারানিতে ওয়াথিলাহ্ বিন আল-আস্কার বর্ণনা থেকেও এর স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়, বিশ্বস্ত মানুষদের একটি সনদ থেকে আল-হাইথামি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে বলেছেন: **"এবং যাযাবরের হিজরত হচ্ছে যাযাবর জীবনেই প্রত্যাবর্তন এবং তোমার আনন্দে ও বেদনাতে এবং তোমার কষ্টে ও সমৃদ্ধিতে শোনা ও মান্য করা, এমনকি তোমার উপরে অন্য কাউকে যদি অধিক পছন্দনীয় করা হয়..."** এবং আনাস থেকে সহীহ্ সনদ সহকারে আহ্মদের বর্ণনা থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়: **"আমি কিছু তরুণকে অনুসরণ করেছিলাম যারা বলছিল যে মুহাম্মাদ (সাঃ) এসেছেন, সুতরাং আমি তাদেরকে অনুসরণ করেছিলাম কিন্তু কিছুই দেখতে পাইনি। তখন তারা আবার বলেছিল যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এসেছেন, সুতরাং আমি আবার তাদেরকে অনুসরণ করেছিলাম কিন্তু কিছুই দেখতে পাইনি। তিনি বলেছিলেনঃ যতক্ষণ পর্যন্ত না মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর সাথী আবু বকর এসেছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মদীনাবাসীর ব্যাকুলতা ও উত্তেজনার অংশ ছিলাম। তখন তাঁরা মদীনাবাসীর পক্ষ থেকে একজনকে পাঠিয়েছিল যাতে করে আনসারদের কাছে তাঁদের আগমনের খবর পৌঁছাতে পারে এবং যখন তাঁরা পৌঁছেছিলেন তখন প্রায় ৫০০ আনসারের একটি দল তাঁদেরকে স্বাগত জানিয়েছিল। আনসাররা বলেছিলঃ নিরাপত্তার মধ্যে ক্ষমতা সহকারে অগ্রসর হোন। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর সাথী তাদের মধ্য হতে বেরিয়ে আসলেন। এবং মদীনাবাসীরাও বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, এমনকি মহিলারাও তাদের বাড়িঘর থেকে বলছিল যে, তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন ব্যক্তি, তাঁদের মধ্যে তিনি (সাঃ) কোন ব্যক্তি?"** এই বর্ণনার মধ্যে নিরাপত্তা ও আইনের বাস্তবায়ন - উভয়টির জন্যই প্রমাণ রয়েছে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ৫০০ আনসারের উপস্থিতি থেকে ও তাদের 'নিরাপত্তায় প্রবেশ করুন' - আহ্বানটি থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের বক্তব্যকে সুনিশ্চিত করেছেন। একইভাবে তাদের দুজনকে যে আনুগত্য করা হবে সেই বক্তব্যও তিনি (সাঃ) নিশ্চিত করেছেন। ফলশ্রুতিতে নিরাপত্তা এবং আনুগত্য হিজরতের স্থানে *(দার আল-হিজরাহ্)* নিশ্চিতভাবে পূর্ণ করা হয়েছিল এবং যদি এগুলো পূরণ করা না হতো তবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হিজরত করতেন না।

আকাবার শপথে আনসাররা নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে আনুগত্য প্রদান - এই শর্ত দু'টি পূরণের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। আল বাইহাকি উবাদাহ্ বিন সামিত হতে শক্তিশালী সনদ সহকারে বর্ণনা করেন যে, **"...আমরা যেসব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্কে (সাঃ) আনুগত্যের শপথ প্রদান করেছিলাম সেগুলো হচ্ছেঃ আমাদের ব্যস্ততায় ও আলস্যে, কষ্টকর সময়ে ও আরামদায়ক অবস্থায় শোনা ও মান্য করা, সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধে, নিন্দুকদের নিন্দায় ভীত না হয়ে আল্লাহ্'র ক্ষেত্রে সত্যকথন এবং যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইয়াসরিবে আসবেন তখন আমরা নিজেদেরকে, আমাদের স্ত্রীদেরকে এবং আমাদের সন্তানদেরকে যেভাবে নিরাপত্তা দিয়ে থাকি সেভাবে তাঁকে (সাঃ) নিরাপত্তা দেবো এবং এসব কিছুর বিনিময়ে জান্নাত লাভ করব। এই আনুগত্যের শপথই আমরা রাসূলুল্লাহ্কে (সাঃ) দিয়েছিলাম"**। এবং নিরাপত্তার বিষয়টি ছিল মুসলিমদের জন্য, যা তার কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়: **"যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইয়াসরিবে আসবেন তখনই আমরা যেভাবে নিজেদেরকে, আমাদের স্ত্রীদেরকে ও আমাদের সন্তানদেরকে রক্ষা করি সেভাবে তাঁকে রক্ষা করব ও বিনিময়ে জান্নাত পাবো"**।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক লিপিবদ্ধ চুক্তিপত্র থেকেও এর অর্থ পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যায়, যাতে তিনি (সাাঃ) ইহুদীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সকলের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন। এটা হিজরতের প্রথম বর্ষে ঘটেছিল, ইবনে ইস্হাকের বর্ণনা থেকে এটা পাওয়া যায় এবং এটাকে 'সাহিফা' নামে ডাকা হয়। চুক্তিপত্রটি ছিল নিম্নরূপঃ

"পরম করুনাময় ও দয়ালু আল্লাহ্'র নামে। এটা হচ্ছে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে লিপিবদ্ধ দলিল। কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মু'মিন ও মুসলিম এবং যারা তাদের অধীনে তাদের সাথে শামিল হবে বা তাদের সাথে মিলেমিশে কাজ করবে তারা এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যদের মোকাবিলায় তারা এক উম্মত হিসেবে গণ্য হবে...। বহিরাগত ব্যতিত সকল বিশ্বাসীরা একে অপরকে রক্ষা করবে... ইহুদীদের উপর তাদের নিজেদের ব্যয়ভার বর্তাবে এবং মুসলিমদের উপর তাদের নিজেদের ব্যয়ভার বর্তাবে। যে কেউ এই চুক্তিনামা গ্রহণকারী কোন পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে তার বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করবে... এই চুক্তিনামা গ্রহণকারী পক্ষসমূহের মধ্যে যদি এমন কোন নতুন সমস্যা বা বিরোধের উদ্ভব হয় যা থেকে দাঙ্গা বেধে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ্ তা'আলা এবং আল্লাহ্'র রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট মীমাংসার্থে উত্থাপিত করতে হবে"।

এর ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, কোন স্থান *দার আল-ইসলাম* হিসেবে গণ্য হবেনা, যদি না নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলিমদের অধীনে থাকে এবং ইসলামের আইনকানুন বাস্তবায়িত হয়-এই শর্তদুটি পূরণ করা যায়। এবং যদি এ দুটি শর্তের মধ্যে কোন একটি অকার্যকর হয়ে যায়, অথবা পূরণ করা না হয়, যেমন: অবিশ্বাসীদের হাতে নিরাপত্তার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় বা *আল-তাগুতের* আইন জনগণের উপর বাস্তবায়িত হয় তবে সেই স্থানটি বহুদেববাদ *(দার আল-শিরক)* বা অবিশ্বাসের আবাসস্থল *(দার আল-কুফর)* হিসেবে পরিগণিত হবে। ইসলামের আবাসস্থল শিরকের বা কুফরের আবাসস্থলে রূপান্তর হওয়ার জন্য দু'টি শর্তের অনুপস্থিতি জরুরী নয় বরং যে কোন একটি শর্তের অনুপস্থিতিই এই রূপান্তরের জন্য যথেষ্ঠ। কোন স্থান অবিশ্বাসের আবাসস্থল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সেখানকার সকল অধিবাসীরা অবিশ্বাসী এবং যেকোন স্থান ইসলামের আবাসস্থল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সেখানকার সকল অধিবাসী মুসলিম হবে। বরং আবাসস্থল *(দার)* শব্দটির অর্থ শারীআহ্'র পরিভাষাকে (প্রকৃত শর'ঈ অর্থ) নির্দেশ করে, ভিন্ন অর্থে: শর'ঈ বাস্তবতা থেকে যেভাবে প্রার্থনা ও উপবাসকে শারীআহ্'র পরিভাষায় সালাত ও সাওম নামে অভিহিত করা হয় সেভাবে এই শব্দটির অর্থও শারীআহ্ প্রদান করে থাকে।

এর ভিত্তিতে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এই শব্দটি সে স্থানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে যেখানকার বেশিরভাগ অধিবাসী খ্রিষ্টান, কিন্তু যদি স্থানটি ইসলামী রাষ্ট্রের অংশ হয় তাহলে সেটা ইসলামের আবাসস্থল *(দার আল-ইসলাম)* হিসেবে গণ্য হবে। কারণ সেখানে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা হয় এবং যতক্ষন পর্যন্ত সেটি ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটার নিরাপত্তার দায়িত্বও ইসলামের অধীনে নিশ্চিত করা হয়।

এবং একইভাবে, যদি কোন একটি অঞ্চলের বেশিরভাগ অধিবাসী মুসলিম হয়, কিন্তু সেটা এমন কোন রাষ্ট্রের অধীনে থাকে যেটা ইসলাম দ্বারা শাসন করে না, কিংবা মুসলিম সামরিক বাহিনী সেটার সুরক্ষা প্রদান করে না, বরং অবিশ্বাসীরা সেই অঞ্চলের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে তবে অবিশ্বাসের আবাসস্থল *(দার আল-কুফর)* শব্দটি এ অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যদিওবা এর অধিকাংশ অধিবাসী মুসলিম হয়ে থাকে।

সুতরাং এখানে আবাসস্থল *(দার)* শব্দটি শর'ঈ বাস্তবতাকে (আইনগত অর্থ) নির্দেশ করে এবং এক্ষেত্রে কোথায় মুসলিমের সংখ্যা বেশি বা কোথায় কম সেটা বিচার্য বিষয় নয়, বরং সেখানকার অধিবাসীদের উপর বাস্তবায়িত আইন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্বই মুখ্য বিষয়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে আবাসস্থল শব্দটির অর্থ আইনগত *(শর'ঈ)* উৎস হতে নেয়া হয়েছে যা এর অর্থের ব্যাখ্যা প্রদান করে। যেরকমভাবে *সালাহ্* শব্দটির অর্থ আইনগত উৎস হতে নেয়া হয়েছে যা এর অর্থের ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং একইভাবে সকল শব্দের শর'ঈগত প্রকৃত অর্থও আইনগত উৎস হতে উৎসারিত হয় এবং ভাষাগত উৎস হতে শব্দসমূহের অর্থ গ্রহন করা হয় না।

ধারা ৩

খলীফা সুনির্দিষ্ট শারীআহ্ বিধিসমূহ গ্রহণ করবেন, যেগুলোকে তিনি সংবিধানের ধারা এবং আইন হিসেবে অনুমোদন দেবেন। যদি তিনি কোন শারীআহ্ আইন গ্রহণ করেন তবে আইনটি এককভাবেই একটি শারীআহ্ আইন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং অবশ্যই সেটার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে, এবং এটি বাধ্যতামূলক আইনে পরিনত হবে যা সকল নাগরিককে প্রকাশ্যে ও গোপনে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

খলীফা সুনির্দিষ্ট শারীআহ্ আইন গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করেন, এ বিষয়ে সাহাবীদের (রাঃ) *ইজ্‌মা* (সাধারণ ঐক্যমত্য) থেকে ধারাটির স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। একইভাবে এটা প্রমাণিত যে, খলীফা কর্তৃক গ্রহণকৃত আইন অনুযায়ী কাজ করা বাধ্যতামূলক। খলীফা কর্তৃক গ্রহণকৃত কোন আইন ব্যতিরেকে অন্য কোন আইন অনুসারে কাজ করা মুসলিমদের জন্য অনুমোদিত নয়, যদিওবা এসব আইনসমূহ কোন একজন *মুজ্‌তাহিদ* (ইসলামের পন্ডিত) কর্তৃক শারীআহ্ আইন হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে। কারণ খলীফা কর্তৃক গৃহীত আইনই হচ্ছে আল্লাহ্'র আইন যা যথাযথভাবে অনুসরণ করা সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। খোলাফায়ে রাশেদাহ্গণ এভাবেই অগ্রসর হয়েছিলেন; তারা সুনির্দিষ্ট কিছু আইন গ্রহণ করেছিলেন এবং সেগুলো বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে, সাহাবীগণসহ (রাঃ) সকল মুসলিমই খলীফা কর্তৃক গৃহীত আইন অনুসারেই কাজ করেছেন এবং নিজেদের *ইজ্‌তিহাদকে* (ইসলামী উৎসসমূহ থেকে উদ্ভুত ইসলামী মতামত) পরিত্যাগ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, আবু বকর (রাঃ) তালাকের ক্ষেত্রে যে আইন বাস্তবায়ন করেছিলেন সেটি হচ্ছে: এক বসায় তিন তালাক ঘোষনা করা হলেও তা এক তালাক হিসেবে গন্য হবে; তিনি (রাঃ) সম্পদ বিতরণের ক্ষেত্রে যে আইন গ্রহন করেছিলেন সেটি হচ্ছে: মুসলিমদের মধ্যে সম্পদসমূহ সমভাবে বিতরণ করা হবে এবং এক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণে জ্যেষ্ঠতা বা অন্য কোনকিছু বিবেচ্য বিষয় হবে না। বিচারক, ওয়ালীসহ (গভর্ণর) সকল মুসলিম তাঁর (রাঃ) গৃহীত আইন বাস্তবায়ন করেছিলেন। যখন উমর (রাঃ) খলীফা হন তখন তিনি একই বিষয়ে আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক গৃহীত মতামত বাদ দিয়ে ভিন্ন মতামত গ্রহণ করেছিলেন; তিনি একইসাথে ঘোষণা করা তিন তালাককে তিন তালাক হিসেবে গণ্য করার আইন গ্রহণ করেছিলেন এবং মুসলিমদের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সমভাবে না দিয়ে ইসলাম গ্রহণে জ্যেষ্ঠতা এবং জনগণের প্রয়োজনকে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতেন। মুসলিমরা এই ক্ষেত্রে তাঁকে (রাঃ) যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন এবং বিচারক ও গভর্নরগণ এই আইন বাস্তবায়ন করেছেন। অতঃপর যখন তিনি (রাঃ) যুদ্ধের মাধ্যমে জয়কৃত ভূমিসমূহকে মুজাহিদ বা মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন না করে *বায়তুল মালের* (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে গণ্য করে সেগুলোর মালিককে খারাজের বিনিময়ে ভোগ-দখল করার আইন গ্রহণ করেন তখন গভর্নরগণ ও বিচারকগণ যথাযথভাবে তা মেনে চলেন এবং তাঁর (রাঃ) গৃহীত আইন বাস্তবায়ন করেন।

আইন গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল খোলাফায়ে রাশেদাহ্গণ এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন এবং জনগণকে তাদের নিজস্ব *ইজ্‌তিহাদ* ও কাজের ক্ষেত্রে অনুসৃত আইন পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে খলীফা কর্তৃক গৃহীত আইন মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং সাহাবীদের (রাঃ) *ইজ্‌মা* দু'টি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রথমটি হচ্ছে: খলীফার আইন গ্রহণের অধিকার এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে: খলীফা কর্তৃক গৃহীত আইন অনুসারে কাজ করার বাধ্যবাধকতা। সাহাবাদের (রাঃ) এই ইজ্‌মাকে ভিত্তি করে শারীআহ্'র বিখ্যাত মূলনীতিসমূহ উদ্ভুত হয়েছে: *"খলীফা উদ্ভুত সকল সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য যথাযথ হুকুম গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন"*, *"ইমামের আদেশ মতভেদের অবসান ঘটায়*, এবং *"ইমামের আদেশ মান্য করা বাধ্যতামূলক"*।

একটিমাত্র ইসলামী মতামত গ্রহণের বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে প্রমাণ হচ্ছে যে, একটি বিষয়ে অনেকগুলো ইসলামী মতামত থাকতে পারে, অতএব যেকোন বিষয়ে শারীআহ্ আইন অনুযায়ী কাজ করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ইসলামী মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক। এর কারণ হচ্ছে, ইবাদতকারীদের কাজের সাথে সম্পর্কিত শারীআহ্ আইনসমূহ বিধানকর্তা কর্তৃক মনোনীত জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিনিধিত্ব করে। আর এই আইনগুলো কুর'আন ও রাসূলের (সাঃ) হাদিস থেকে এসেছে এবং আরবী ভাষা ও শারীআহ্ অনুযায়ী এগুলোর অনেক কিছুরই অনেকগুলো সম্ভাব্য অর্থ থাকতে পারে। এই কারণে এটা স্বাভাবিক এবং অনিবার্য যে মানুষ বিধানকর্তার বাণীকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে পার্থক্য করবে এবং এই উপলব্ধির বিভিন্নতা এমন পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে যা প্রকৃত অর্থের মধ্যে বৈসাদৃশ্য কিংবা অসঙ্গতি নিয়ে আসতে পারে। ফলশ্রুতিতে, অনিবার্যভাবেই একই বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের ও

অসঙ্গতিপূর্ণ উপলব্ধি তৈরী হতে পারে এবং এর ভিত্তিতে একই বিষয়ে অনেকগুলো আলাদা ও অসঙ্গতিপূর্ণ মতামত আসতে পারে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আহ্যাবের যুদ্ধে যখন বলেছিলেন: **"বনু কুরাইযাহ্ ব্যতিত অন্য কোথাও তোমাদের কারও 'আসর পড়া উচিত নয়"** (ইবনে উমর হতে আল-বুখারী কর্তৃক বর্ণিত), তখন কিছু সাহাবী (রাঃ) এটা মনে করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উপরোক্ত কথার মাধ্যমে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন, অতএব তারা বনু কুরাইযাহ্'র যাত্রাপথে '*আসর* পড়ে নেন; কিন্তু অন্যান্য সাহাবীগণ এটা মনে করেছিলেন যে, তিনি (সাঃ) তাদেরকে আক্ষরিকঅর্থে শুধুমাত্র বনু কুরাইযাহ্'তেই 'আসরের নামায পড়তে বলেছেন, সুতরাং গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত তারা 'আসর পড়তে বিলম্ব করেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিষয়টি শুনেন তখন তিনি (সাঃ) উভয় মতামতকেই অনুমোদন দেন; এবং এ ধরনের অনেক আয়াত ও হাদিস রয়েছে।

একই বিষয়ে মতামতের এই পার্থক্য মুসলিমদেরকে বিভিন্ন মতের মধ্য থেকে একটি মত গ্রহণ করাকে বাধ্যতামূলক করে দেয়। কারণ সবগুলোই হচ্ছে শারীআহ্'র আইন এবং একজন মানুষের ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে আল্লাহ্'র হুকুম একাধিক হতে পারে না। সুতরাং শারীআহ্ আইন অনুসারে কাজ করার জন্য যেকোন একটি আইন নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য। সুতরাং, যখন একজন মুসলিম কোন কাজ করতে প্রবৃত্ত হয় তখন তাকে একটি সুনির্দিষ্ট শারীআহ্ আইন গ্রহণ করতে হয় ও এটা বাধ্যতামূলক, কারণ যেকোন কাজ শারীআহ্ আইন অনুসারে সম্পাদন করতে মুসলিম বাধ্য। শারীআহ্ আইন অনুসারে যেকোন *ফরয* (বাধ্যতামূলক), *মানদুব* (পছন্দনীয়), *হারাম* (নিষিদ্ধ), *মাকরুহ্* (অপছন্দনীয়) বা *মুবাহ্* (অনুমোদিত) কাজ করার বাধ্যবাধকতা মুসলিমকে একটি সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণে বাধ্য করে। এজন্যই যেকোন কাজ করার বিধান নেয়ার সময়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সুনির্দিষ্ট শারীআহ্ আইন গ্রহণ বাধ্যতামূলক, এক্ষেত্রে সে *মুজ্তাহিদ* নাকি *মুকাল্লিদ্* (যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে নিজে হুকুম বের না করে একজন মুজতাহিদের মতামত অনুসরণ করে) কিংবা, খলীফা নাকি খলীফা ব্যতিত অন্য কেউ, সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়।

খলীফার ক্ষেত্রে এটা বাধ্যতামূলক যে, তিনি জনগণের বিভিন্ন বিষয়াদি ব্যবস্থাপনা করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইনসমূহ গ্রহণ করবেন। অতএব, সরকার পরিচালনা এবং শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে সকল মুসলিমের জন্য সাধারণ বিধি-বিধান সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহন করা খলীফার জন্য একান্ত প্রয়োজন। এই আইনগুলো হতে পারে *যাকাত*, শুল্ক, *খারাজ* (ভূমির খাজনা), আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত সবকিছু।

যাহোক, খলীফা কর্তৃক আইন গ্রহণের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে; জনগণের বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার জন্য যদি সুনির্দিষ্ট ইসলামী আইন গ্রহণ জরুরী হয় তবে খলীফার জন্য তা গ্রহণ করা *ফরয* (বাধ্যতামূলক) হয়ে যায়। এটা শারীআহ্'র সেই মূলনীতির সাথে সম্পর্কিত যেটাতে বলা হয়েছে যে: *"কোন ফরয আদায়ের জন্য যে কাজ জরুরী, সেটি নিজেই একটি ফরয"* যেমন: আন্তর্জাতিক চুক্তি সাক্ষর। আর, খলিফা যদি সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ ব্যতিরেকেই ইসলামী শারীআহ্ অনুসারে কোন বিষয়ে জনগণের বিষয়াদি ব্যবস্থাপনা করতে পারেন তবে সেক্ষেত্রে তার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক না হয়ে *মুবাহ্* (অনুমোদিত) হয়ে যাবে, যেমন: *নিসাব আল-শাহাদাহ্* (প্রামাণিক সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সাক্ষীর সংখ্যা)। এই ক্ষেত্রে তার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ অথবা অগ্রহণ দু'টোই অনুমোদিত শ্রেণীতে পড়বে, বাধ্যতামূলক শ্রেণীতে নয়। এটা এরকম কারণ, এ বিষয়ে সাহাবাদের (রাঃ) *ইজ্মা* রয়েছে যে- ইমাম সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু ইমামকে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করতে হবে- এর স্বপক্ষে কোন *ইজ্মা* নেই। সুতরাং, আইন গ্রহণ নিজেই অনুমোদিত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত এবং এটা তখনই বাধ্যতামূলক হয় যখন সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ ব্যতিরেকে জনগণের বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার বাধ্যবাধকতাটি পূরণ করা সম্ভবপর হয় না। এক্ষেত্রে এটা তখন বাধ্যতামূলক হয়ে যায় যাতে করে সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়।

ধারা ৪

যাকাত, জিহাদ এবং উম্মাহ্'র একতাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা ব্যতিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির (ব্যক্তিগত ইবাদত) সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয়ে খলীফা সুনির্দিষ্ট শারীআহ্ আইন গ্রহণ করবেন না, এবং ইসলামী আক্বীদাহ্'র সাথে সম্পর্কিত মতামতসমূহের মধ্য থেকে কোন সুনির্দিষ্ট মতকে নির্ধারণ করে দেবেন না।

এ বিষয়ে সাহাবাদের ঐক্যমত্য রয়েছে যে, খলীফার এককভাবে আইন গ্রহণের অধিকার রয়েছে এবং এই ঐক্যমত্য থেকে শারীআহ্'র দুটি বিখ্যাত মূলনীতির উদ্ভব হয়েছে: "ইমামের আদেশ মতভেদের অবসান ঘটায়" এবং "ইমামের আদেশ মান্য করা বাধ্যতামূলক"। খলীফা আল-মামুনের সময়কার একটি ঘটনায় (কুর'আন সৃষ্টি সংক্রান্ত ফিতনা বা বিবাদ) আক্বাইদের (আক্বীদাহ্'র বহুবচন, বিশ্বাসসমূহ) সাথে সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট চিন্তাসমূহ গ্রহণ করা হয়, যা খলীফার জন্য ফিতনা বয়ে নিয়ে আসে এবং মুসলিমদের মধ্যে *ফিতনা* বা কোন্দল ছড়িয়ে পড়ে। সেজন্য খলীফা আক্বিদাহ্ ও ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকাকে যুক্তিযুক্ত মনে করতে পারেন, যাতে করে এধরনের সমস্যা দেখা না দেয় এবং মুসলিমদের মধ্যে মানসিক প্রশান্তি বজায় থাকে ও তাদের আস্থা অর্জন করা যায়। যাহোক, আক্বাইদ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার মানে এটা নয় যে খলীফার জন্য তা নিষিদ্ধ, বরং এর মানে হচ্ছে যে খলীফা আইন গ্রহন, বা আইন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা- এ দুইয়ের মধ্যে আইন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকাকেই পছন্দ করবেন। অতএব তিনি সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ নাও করতে পারেন। একারণেই এই ধারাটিতে বলা হয়েছে যে, খলীফা "সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করেন না" এবং এটা বলা হয়নি যে, খলীফার জন্য "সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ নিষিদ্ধ", যা নির্দেশ করে যে তিনি সুনির্দিষ্ট আইন নাও গ্রহণ করতে পারেন।

দুটি বিষয়ের ভিত্তিতে খলীফা আক্বাইদ ও ইবাদতের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহন করা থেকে বিরত থাকতে পারেন, প্রথমত: আক্বীদাহ্র বিষয়ে জনগণকে একটি সুনির্দিষ্ট মতামত অনুসরণে বাধ্য করার কঠিন সমস্যা, দ্বিতীয়ত: সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহনে খলীফাকে যে বিষয়টি উৎসাহিত করে সেটি হচ্ছে, বাস্তবে একটিমাত্র মতামত গ্রহনের মাধ্যমে জনগণের বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা করা এবং রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার একতাকে সুরক্ষিত করা। তাই তিনি মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে ও জনসাধারনের বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহন করে থাকেন এবং মানুষের সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্কের বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করেন না।

প্রথম বিষয়টির ক্ষেত্রে: অবিশ্বাসীদের উপর চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইসলামী আক্বীদাহ্ গ্রহনে বাধ্য করাকে এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিত্যাগে বাধ্য করাকে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) নিষিদ্ধ করেছেন এবং অন্যান্য শারীআহ্ আইন মেনে চলতে বাধ্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব বৃহত্তর যুক্তিতে এটা বলা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের বিশ্বাসসমূহ ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিধিবিধানসমূহ পরিত্যাগে বাধ্য করা যাবে না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ইবাদত সংক্রান্ত বিধিবিধানসমূহ শারীআহ্ আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো পরিত্যাগে বাধ্য করা যাবে না। এছাড়াও, বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত ধারনাসমূহ পরিত্যাগে বাধ্য করার বিষয়টি কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবে এবং সেসব ধারনার প্রতি আনুগত্যকে সন্দেহাতীতভাবে আরও উদ্দীপ্ত করবে, এর প্রমান হচ্ছে ইমামদের সাথে বিরোধসমূহ, উদাহরণস্বরূপ: কুর'আন সৃষ্টির ফিতনা বিষয়ে ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বলের সাথে যা ঘটেছিল। যখন তাদেরকে প্রহার ও অপমান করা হয়েছিল তখন তারা বশ্যতা স্বীকার করেননি এবং তাদের বিশ্বাসও পরিত্যাগ করেননি। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: **"(আল্লাহ্) দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনরূপ সংকীর্ণতা আরোপ করেননি"**। [আল হাজ্জ: ৭৮]

যেহেতু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি বা ইবাদতসমূহ বিশ্বাসের মতো সেহেতু শারীআহ্'র বিধান হিসেবে ভিন্নমত পোষনকারী মানুষের উপর বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট আইন প্রয়োগ করা হলে সেটা তার জন্য পীড়াদায়ক হবে, কারণ এই বিষয়গুলো আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের আওতাধীন এবং এবং আক্বীদার সাথে পরিবেষ্টিত। অতএব খলীফার কোন অবস্থাতেই এমন কোন সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করা উচিত নয় যা মুসলিমদের জন্য মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে। তবে এটা করা খলীফার জন্য নিষিদ্ধ নয়।

দ্বিতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে: বিশ্বাসসমূহ ও ইবাদতসমূহ হচ্ছে মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সম্পর্কের অন্তর্গত এবং এগুলো হতে সমস্যার উদ্ভব হয় না, কিন্তু লেনদেন ও শাস্তির বিষয়টি এর বিপরীত, কারণ এগুলো সমাজের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঘটে থাকে এবং এ ধরণের সম্পর্কসমূহ হতে সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে। লেনদেনের মূলে রয়েছে বিরোধের নিষ্পত্তি এবং খলীফা কর্তৃক গৃহীত সুনির্দিষ্ট আইনের মূলে রয়েছে জনগণের বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা। সম্পর্কসমূহ হিসেবে জনগণের মধ্যে যা রয়েছে তার প্রেক্ষিতে খলীফা তাদের বিষয়াদি প্রকাশ্যেই সমাধান করবেন এবং এক্ষেত্রে আল্লাহ্'র সাথে তাদের সম্পর্কের অন্তর্গত কোন বিষয়ের সাথে, কিংবা তাদের বিশ্বাস ও ইবাদত সংক্রান্ত কোন কিছুর সাথে এর কোনরূপ সম্পর্ক নেই।

একারণে, বাস্তবিকভাবে শুধুমাত্র জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার জন্য খলীফা সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করতে পারেন এবং জনগণ (ব্যক্তি) ও আল্লাহ্'র মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহন করার কোন যৌক্তিক বাস্তবতা নেই। অতএব সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহনের বাস্তবতা হচ্ছে যে, একমাত্র জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে এবং সার্বজনীন বা প্রকাশ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেই এটা করা হতে পারে। সুতরাং মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিংবা বিশ্বাস ও ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহনের বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। এর ভিত্তিতেই খলীফা সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহনের বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহন করবেন না। যদিও এটা করা তার জন্য নিষিদ্ধ নয়।

সুতরাং, মর্মপীড়া বা প্রায়োগিক সমস্যা এবং সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহনের যৌক্তিক বাস্তবতার সাথে বিরোধ- এই দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে খলীফা বিশ্বাস ও ইবাদত সংক্রান্ত বিধিবিধানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহন করবেন না। কিন্তু, যদি কোন সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসের (আক্বিদার) ক্ষেত্রে কুর'আন ও সুন্নাহ্তে পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা থাকে, তাহলে সুনির্দিষ্ট আইন (উক্ত বিশ্বাসের উপর নিষেধাজ্ঞা) গ্রহন করা হবে। যদিওবা এটা প্রয়োগে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে হয়, কিংবা তা সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহনের বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক হয়, যাতে করে শারীআহ্কে অগ্রাধিকার দেয়া যায়, উদাহরণ স্বরূপ: দৃঢ় প্রত্যয় ব্যতিত বিশ্বাসসমূহ গ্রহন করা যাবে না। একইভাবে, যদি মুসলিমদের বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার জন্য জনগণকে একটি সুনির্দিষ্ট আইনের আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে এটা করা যেতে পারে, মুসলিমদের একতা ও রাষ্ট্রের একতা বজায় রাখার নির্দেশের বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ্'র ভিত্তিতে এসেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়: হজ্জ ও রমযানের সময় নির্ধারণ, ঈদ উদযাপন, যাকাত এবং জিহাদ।

এই বিষয়গুলোতে খলীফা সুনির্দিষ্ট শারীআহ্ বিধান গ্রহন করবেন; কেননা, আক্বীদার ক্ষেত্রে সঠিক বিশ্বাসটিই বলবৎ করা হয় এবং বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় না। এটা সেই উৎস থেকে এসেছে যা বর্ণনা ও অর্থের *(ক্বাতি' যুবুত, ক্বাতি' দালালাহ্)* দিক দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত। ইবাদতের এইসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহন করা হলে তাদের মধ্যে কোনরূপ কষ্ট দেখা দেবে না, কারণ এগুলো নামাযের মতো কেবলমাত্র মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সম্পর্কিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এই বিষয়গুলো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে জড়িত, যেমন: উৎসবসমূহ। এই কারণে আক্বীদাহ্ এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে এই দুটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান গ্রহন অনুমোদিত।

কোন একটি চিন্তা আক্বীদাহ্ থেকে নাকি শারীআহ্'র বিধি-বিধান থেকে উদ্ভুত হয়েছে তা নির্ভর করবে শারীআহ্ দলিলের উপর। সুতরাং যদি শারীআহ্'র দলিলটি আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বান্দার কাজের সাথে সম্পর্কিত হয়, তবে তা হচ্ছে শারীআহ্'র বিধি-বিধান, কারণ শারীআহ্ আইন হচ্ছে আইন-প্রণেতার হুকুম যা বান্দার কাজের সাথে সম্পর্কিত, এবং যদি তা বান্দার কাজের সাথে সম্পর্কিত না হয় তবে তা আক্বিদার অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু, আক্বীদাহ্ ও শারীআহ্ বিধিবিধানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে: যেসব বিষয়ের উপরে শুধুমাত্র ঈমান আনতে বলা হয়েছে, কিন্তু কোন ধরনের কাজকে সেগুলোর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি, সেসব বিষয় আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত, উদাহরনস্বরূপ: অদৃশ্যের বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা এবং তথ্যসমূহ। যে বিষয়গুলো থেকে কাজের নির্দেশ আসে সেগুলো শারীআহ্ বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আল্লাহ্'র তরফ থেকে আসা নিম্নোক্ত বাণীসমূহ আক্বীদার সাথে সম্পর্কিত: **"হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং যে কিতাব তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন তার প্রতি এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন তার প্রতি"** [নিসা ঃ ১৩৬], **"আল্লাহ্ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা"** [যুমার ঃ ৬২], **"আর এ কিতাবে বর্ণনা করেন মারইয়ামের কথা..."** [মারইয়াম ঃ ১৬], এবং **"সেদিন মানুষ ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় হয়ে যাবে; এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মতো"** [কারি'আ ঃ ৪-৫]। এ সবগুলোই আক্বীদাহ্'র অন্তর্ভূক্ত, কারণ এগুলো বান্দার কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়;

এগুলোর উপরে শুধুমাত্র ঈমান আনতে হবে এবং এগুলোতে কোন কাজের নির্দেশ নেই। এছাড়াও আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন: **"এবং আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন"** [বাক্বারা: ২৭৫], **"যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে তাদের যথাযথ পারিশ্রমিক দেবে"** [তালাকঃ ৬], এবং তিনি বলেছেন: **"আর আপনি যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন, তখন ন্যায়ভিত্তিক বিচার করবেন"** [নিসা ঃ ৫৮], এই আয়াতগুলো শারীআহ্ বিধানের অন্তর্ভূক্ত, কারণ এগুলো বান্দার কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এগুলোতে কাজ করার হুকুম বিদ্যমান।

এর ভিত্তিতে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাধ্যমেই যে নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তিনিই (সাঃ) যে সর্বশেষ নবী তা বিশ্বাস করা *আক্বীদার* অন্তর্গত, কারণ এর উপর ঈমান আনতে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে, ইমামত বা ভিন্ন শব্দে খিলাফত আক্বীদার অন্তর্গত বিষয় নয়, কারণ এটা ঐসব বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত যেগুলোর সাথে কাজকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা আক্বীদা থেকে এসেছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সকল ধরনের গুনাহ্ থেকে মুক্ত। পক্ষান্তরে, কুরাইশ, আহল্ আল-বাইত (নবীর পরিবার) কিংবা সকল মুসলিমের মধ্য থেকে যেকোন মুসলিমের খলীফা হওয়ার বিষয়টি শারীআহ্ বিধানের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি আক্বীদাগত বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়, কারণ এটা বান্দার কাজের সাথে ও খলীফা হওয়ার শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই অর্থে, কাজের সাথে সম্পর্কহীন সকল বিষয় বা যেসব বিষয়র উপর শুধুমাত্র ঈমান আনতে হয়েছে সেগুলো আক্বীদার অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু যেসব বিষয়ের সাথে বান্দার কাজের সম্পর্ক রয়েছে ও যেগুলোর ভিত্তিতে কাজ করতে বলা হয়েছে সেগুলো শারীআহ্ বিধানের অন্তর্ভূক্ত।

আক্বীদাহ্'র বাস্তবতা হচ্ছে যে এটি একটি মৌলিক চিন্তা; এর অর্থ হচ্ছে যে, আক্বীদাহ্ হতে হলে অন্য সবকিছুকে পরিমাপের মৌলিক মাপকাঠি হিসেবে এটাকে নিতে হবে; অতএব, যদি কোন চিন্তা মৌলিক না হয় তবে তা আক্বীদাহ্ হিসেবে গণ্য হবে না। এছাড়াও, আক্বীদাহ্ হচ্ছে মহাবিশ্ব, মানুষ ও জীবন, এ জীবনের পূর্বে কি ছিল ও এরপরে কি আসবে এবং এই জীবনের সাথে এর পূর্বে কি ছিলো ও এরপরে কি আসবে সেসম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা। এই সংজ্ঞা প্রত্যেক আক্বীদার জন্য প্রযোজ্য এবং এটা ইসলামী আক্বীদার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই সংজ্ঞার মধ্যে অদৃশ্যের বিষয়গুলোও অন্তর্ভূক্ত, সেই মোতবেক এই সামগ্রিক চিন্তার ধারনা থেকে উৎসারিত সকল চিন্তা আক্বীদাহ্ থেকে আসে। সুতরাং আল্লাহ্, বিচার দিবস, মহাবিশ্বের সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত এবং এধরনের সবকিছু আক্বীদাহ্'র অংশ, কিন্তু এগুলোর সাথে সম্পর্কহীন বিষয়সমূহ আক্বীদাহ্'র অন্তর্ভূক্ত নয়।

ধারা ৫

ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিক *শরীয়াহ্* প্রদত্ত অধিকার ভোগ করবে এবং নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে।

ধারা ৬

রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মধ্যে শাসনকার্যে, বিচার-ফয়সালাতে, বিভিন্ন বিষয়াদির ব্যবস্থাপনায় কিংবা এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ে কোন ধরনের বৈষম্য করতে পারবে না। বরং, প্রত্যেকের সাথে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমান আচরন করতে হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বহনকারী, মুসলিম কিংবা *জিম্মাহ্* চুক্তির অন্তর্গত (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক), ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত আইনসমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য এই ধারা দুটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যেসব মুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের বাহিরে বসবাস করে এবং যারা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক নয়, তাদের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, তারা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করবে না। সুলাইমান ইবনে বুরাইদাহ্ হতে বর্ণিত আছে যে, তার পিতা বলেছেন: ***"যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কাউকে কোন বাহিনীর কিংবা অভিযানের আমির নিযুক্ত করতেন তখন তিনি (সাঃ) তাকে আল্লাহ্কে ভয় করতে বলতেন এবং সাথের মুসলিমদের প্রতি সদয় আচরন করতে বলতেন। তিনি (সাঃ) বলতেন যে: "আল্লাহ্র নামে এবং আল্লাহ্র পথে বিজয় আনয়ন কর। যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। জয় কর এবং যুদ্ধলব্ধ মালামাল আত্মসাৎ করো না; প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না এবং মৃতদেহ বিকৃত করো না। শিশুদের হত্যা করো না এবং যদি তোমরা কোন মুশরিক শত্রুর দেখা পাও, তবে তাদেরকে তিনটি বিকল্পের দিকে আহ্বান করো। যদি এগুলোর মধ্যে কোন একটিতে তারা সাড়া দেয়, তবে তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ কর এবং তাদের কোন ক্ষতি করা থেকে বিরত থাক। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রন জানাও; যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া দেয় তবে তা মেনে নাও এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত হও। অতঃপর তাদেরকে তাদের আবাসস্থল হতে মুহাজিরদের আবাসস্থলে চলে আসার আমন্ত্রন জানাও এবং তাদেরকে বল যে, যদি তারা এটা করে তবে মুহাজিরদের মতো সকল অধিকার ভোগ করবে ও তাদের মতো দায়িত্ব পালন করবে। যদি তারা দেশ ত্যাগে রাজি না হয় তবে তাদেরকে বলো যে, তারা বেদুঈন মুসলিমদের মর্যাদা পাবে। কিন্তু তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কিংবা ফাইয়ের কোন অংশ পাবে না, যদি না তারা মুসলিমদের সাথে জিহাদে সম্পৃক্ত হয়।"*** (মুসলিম কর্তৃক সংকলিত)। এই বর্ণনাটি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে যে, যদি কেউ *দার আল-ইসলামে* হিজরত না করে তবে সে নাগরিকত্বের কোন অধিকার ভোগ করতে পারবে না, যদিওবা সে মুসলিম হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যাতে করে তারা সেই একই অধিকার ভোগ করতে পারে যা মুসলিমরা ভোগ করে থাকে এবং মুসলিমদের মতো একই দায়িত্ব পালন করতে পারে। তিনি (সাঃ) বলেছেন: ***"অতঃপর তাদেরকে তাদের আবাসস্থল হতে মুহাজিরদের আবাসস্থলে চলে আসার আহ্বান জানাও এবং তাদেরকে বল যে, যদি তারা এটা করে তবে মুহাজিরদের মতো সকল অধিকার ভোগ করবে এবং তাদের মতো একই দায়িত্ব পালন করবে।"*** এই বর্ণনার বিষয়বস্তু এই শর্ত দেয় যে, আমাদের মতো একই অধিকার পাওয়ার জন্য এবং আমাদের মতো একই দায়িত্ব পালনের জন্য তাদেরকে দেশত্যাগ করতে হবে। এই বর্ণনা থেকে এটাও বোঝা যায় যে, যদি তারা দেশত্যাগ না করত তবে তারা মুহাজিরদের মতো অধিকার ভোগ করতে পারত না; ভিন্নভাবে বলা যায় যে ইসলামের আবাসস্থল *(দার আল-ইসলাম)* কর্তৃক প্রদত্ত অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারত না। সুতরাং, এই বর্ণনাটি মুহাজিরদের আবাসস্থলে যারা গমন করবে এবং যারা গমন করবে না তাদের মধ্যে আইনগত অধিকারের পার্থক্যসমূহকে ব্যাখ্যা করে, এবং মুহাজিরদের আবাসস্থলই ছিল ইসলামের আবাসস্থল এবং অন্যান্য স্থানগুলো ছিল অবিশ্বাসের আবাসস্থল *(দার আল-কুফর)*। কোন ব্যক্তির বসবাসের স্থানের উপর নির্ভর করে যে সে *দার আল-ইসলামের* নাগরিক, নাকি *দার আল-কুফরের* নাগরিক। অতএব, কোন ব্যক্তি তার আবাসস্থল হিসেবে যে স্থানকে পছন্দ করবে সেটাই তার নাগরিকত্ব নির্ধারন করবে; স্থানটি কি *দার আল-ইসলাম* নাকি *দার আল-কুফর*? যদি সেটা *দার আল-ইসলাম* হয় তবে সেস্থানে *দার আল-ইসলামের* আইন বলবৎ হবে, এবং এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি ইসলামী নাগরিকত্ব লাভ করবে, যদি সেটা *দার আল-কুফর* হয়ে থাকে তবে সেস্থানে *দার আল-কুফরের* আইন বলবৎ হবে এবং সেখানে বসবাসকারী ব্যক্তি ইসলামী নাগরিকত্ব বহনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে না।

দার আল-ইসলামে বসবাসকারী *জিম্মিদের* উপর রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগ করা হয়, যাতে করে তাদেরকে অধিবাসীদের অধিকার দেয়া যায় এবং তারা নাগরিকত্ব বহন করতে পারে। *জিম্মি* হলো সেইসব ব্যক্তি যারা ইসলাম ব্যতিত অন্য *দ্বীনকে* আঁকড়ে থাকে এবং ইসলাম ভিন্ন অন্য বিশ্বাসকে ধারন করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়। *জিম্মি* শব্দটি *জিম্মাহ্* শব্দ থেকে উদ্ভুত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে শপথ বা ওয়াদা। অর্থাৎ, *জিম্মি* হচ্ছে সেইসব ব্যক্তি

যাদেরকে আমরা শান্তি চুক্তি মোতাবেক আচরন করার এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাদের বিষয়াদি দেখাশোনা করার ও মেলামেশা করার ওয়াদা প্রদান করেছি।

ইসলাম *জিম্মাহ্* চুক্তির অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনেক বিধান প্রদান করেছে, যেগুলোতে তাদেরকে নাগরিকত্বের অধিকার প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে এবং তাদের উপর এর দায়িত্বসমূহ অর্পণ করা হয়েছে। ইসলাম এরকম একটি রূপরেখা প্রদান করে যে, *জিম্মিরা* আমাদের মতো একই অধিকার ভোগ করবে এবং আমাদের মতো একই আইন মেনে চলবে। তারা ন্যায়-বিচার ও সম অধিকার ভোগ করবে- এবিষয়টি আল্লাহ্‌র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বানী হতে সাধারন আদেশ হিসেবে উদ্ভুত হয়েছে: ***"এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়ভিত্তিক বিচার করবে।"*** [সূরা নিসা ঃ ৫৮] এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেছেন: ***"এবং তোমরা অবিচল থাকবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে; এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কখনও ন্যায়বিচার বর্জন করতে প্ররোচিত না করে। ন্যায়বিচার করবে, এটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী"*** (মায়িদাহ্:৮), এবং কিতাবধারী ব্যক্তিদের মধ্যে ন্যায়বিচারের বিষয়ে আল্লাহ্‌র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বাণী থেকেও এটা স্পষ্ট হয়: ***"আর যদি বিচার ফয়সালা করেন তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে বিচার করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন"*** (মায়িদাহ:৪২)।

ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে আমরা যেসব বিধান মেনে চলি সেগুলো *জিম্মিদেরও* মানতে হবে, এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) বক্তব্য এবং কাজ হতে পাওয়া যায়। তিনি (সাঃ) মুসলিম ও অবিশ্বাসী সবার উপরে একই শাস্তি বাস্তবায়ন করেছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) একজন ইহুদীকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন কারন সে একজন নারীকে হত্যা করেছিল। আনাস বিন মালিক হতে আল-বুখারীতে বর্ণিত আছে যে: ***"একজন নারী অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় মদীনায় বের হলে একজন ইহুদী তাকে পাথর ছুড়ে আক্রমন করে। অতঃপর তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) কাছে নেয়া হলে তিনি (সাঃ) তাকে বলেন: অমুক কি তোমাকে জখম করেছে? এর জবাবে মহিলাটি তার হাত উঁচু করে, এবং তিনি (সাঃ) ফিরে আসেন এবং আবার বলেন: অমুক কি তোমাকে জখম করেছে? এর জবাবে মহিলাটি তার হাত উঁচু করে, এবং তিনি (সাঃ) আবার ফিরে আসেন এবং বলেন: অমুক কি তোমাকে জখম করেছে? তখন মহিলাটির হাত নিচু হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ইহুদীটিকে নিয়ে আসতে বলেন এবং শাস্তিস্বরূপ দুটি পাথরের দ্বারা তার মাথাও চুর্ণ করার আদেশ দেন"***। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সামনে একজন ইহুদী পুরুষ ও একজন ইহুদী নারীকে আনা হয় যারা যেনা করেছিল এবং তিনি (সাঃ) তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার নির্দেশ দেন, ইবনে উমর (রাঃ) হতে আল-বুখারীতে বর্ণিত আছে যে: ***"একজন ইহুদী পুরুষ ও নারীকে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) সামনে আনা হয় যারা যেনা করেছিল, এবং তখন তিনি (সাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, "তোমরা তোমাদের কিতাবে কি আদেশ পাও? তাদের ইহুদী আইনজ্ঞ রক্তবর্ণ চেহারায় সেখানে হাজির ছিল। আব্দুল্লাহ্‌ বিন সালাম বললেন তাদেরকে তাওরাতের প্রতি আহ্বান করেন ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌, এবং তারা তাওরাত নিয়ে আসলো এবং তাদের মধ্যে একজন পাথর মেরে হত্যার আয়াতটি হাত দিয়ে ঢেকে রেখে সেটার আগের ও পরের আয়াত পড়তে লাগল। তখন ইবনে সালাম তাকে তার হাত উঠাতে বলেন, এবং পাথর মেরে হত্যার আয়াতটি তার হাতের নিচে পাওয়া গেল। অতএব রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাদের দুজনকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দিলেন।"***

এটা আমাদের কর্তব্য যে, মুসলিমদের যেভাবে নিরাপত্তা দেয়া হয়, সেভাবে *জিম্মিদেরও* নিরাপত্তা দিতে হবে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেছেন: ***"যে একজন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না; এর সুগন্ধ একশত বছরের হাঁটার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়"***, আত-তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছেন যে এটি *হাসান সহীহ্‌*। এবং আল-বুখারীতে এভাবে বর্ণিত আছে যে: ***"চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যাকারী জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। এবং এর সুগন্ধ ৪০ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়"***।

বিভিন্ন বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও জীবনের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মুসলিমরা যে অধিকারসমূহ ভোগ করে থাকে, *জিম্মাহ্‌* চুক্তির অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিরাও সেই একই অধিকারসমূহ ভোগ করে। আবু মুসা আল-আশারি হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন: ***"ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, গরীবদের খবর নাও এবং বন্দীদের মুক্তি দাও"*** (আবু মুসা হতে বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)। আবু উবায়দাহ্‌ বলেছেন: ***"অতএব, জিম্মিরা জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত, তাদের বন্দিরা মুক্ত এবং যদি তাদেরকে উদ্ধার করা হয় তবে তারা জিম্মায় ও ওয়াদাতে মুক্ত হয়ে ফেরত যাবে এবং এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে"***। এবং ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আছে যে: ***"আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) নাজ্‌রানের অধিবাসীদের সাথে শান্তি স্থাপন করেছিলেন"***। এবং সুনানে আবু দাউদের বর্ণনাতে আছে যে, ***"তাদের চার্চসমূহ ধ্বংস করা হবে না, এবং তাদের কোন পাদ্রীকে নির্বাসিত করা হবে না, এবং তাদেরকে তাদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করা হবে না, যদি না তারা নতুন কোন কিছু তৈরী করে এবং সুদের সাথে সম্পৃক্ত হয়"***।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের মধ্যকার অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যেতেন, আনাস হতে আল-বুখারীতে বর্ণিত আছে যে: ***"একজন ইহুদী বালক ছিল যে রাসূলুল্লাহ্‌কে (সাঃ) সহযোগিতা করত, সে অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে দেখতে গেলেন। তিনি (সাঃ) তার মাথার পাশে বসলেন এবং তাকে বললেন- ইসলাম গ্রহণ কর, সে তার বাবার দিকে তাকালো এবং তার বাবা তাকে বলল যে আবুল কাশেমকে মান্য কর, এবং সে ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূল (সাঃ) তাকে রেখে চলে আসলেন এবং বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি তাকে আগুন হতে রক্ষা করলেন"***। এই হাদিসটি এটাই ইঙ্গিত করে যে, অসুস্থ জিম্মিদের দেখতে যাওয়া এবং তাদের সাথে মার্জিত ও বন্ধুভাবাপন্ন আচরন করা অনুমোদিত। আল-বুখারী কর্তৃক বর্নিত আছে যে, উমর বিন আল-খাত্তাব (রাঃ) হতে আমরু বিন মায়মুন বর্ণনা করেন যে, তিনি তার মৃত্যুর সময়ে এই পরামর্শ দিয়ে যান: ***"আমার পরে যে খলিফা হবে তার প্রতি আমার এরূপ ও এরূপ নির্দেশনা রয়েছে, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর শপথ করে তাকে নির্দেশনা দিচ্ছি যে, তাদের প্রতি তাদের ওয়াদা তার পূরণ করা উচিত, তাদের পক্ষ হতে যুদ্ধ করা উচিত এবং তাদের উপর ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা চাপানো থেকে বিরত থাকা উচিত"***।

জিম্মিদেরকে তাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে বাধা প্রদান করা উচিত নয়, এবিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বক্তব্য আবু উবায়েদ, উরওয়া হতে *আল-আমওয়াল*-এ বর্ণনা করেছেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইয়েমেনের লোকদের উদ্দেশ্য করে লেখেন: ***"ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষদের উপর বল প্রয়োগ করে বিশ্বাস পরিত্যাগে বাধ্য করা যাবে না"***। মুসলিমদের নিকট থেকে যেরকমভাবে শুল্ক নেয়া হবে না সেরকমভাবে *জিম্মিদের* নিকট থেকেও শুল্ক নেয়া হবে না। আব্দুল রহমান বিন মা'কাল হতে আবু উবায়েদ *আল-আমওয়াল*-এ বর্ণনা করেন: ***"আমি যিয়াদ বিন হাদিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম- তুমি কাদের নিকট হতে কর নিতে? সে বলেছিল- আমরা মুসলিম এবং চুক্তিবদ্ধ জিম্মিদের নিকট হতে কর নিতাম না। সুতরাং আমি বলেছিলাম: তাহলে কাদের উপর কর আরোপ করতে? সে বলেছিল- যুদ্ধ সম্পর্কিত দেশের (যেসব দেশের সাথে কোনরূপ চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক নেই) ব্যবসায়ীদের উপর, আমরা তাদের দেশে গেলে যেভাবে তারা আমাদের উপর কর আরোপ করে থাকে, সেভাবে আমরা একই হারে তাদের উপর কর ধার্য করি"***। কর আদায়কারী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে শুল্ক নিয়ে থাকে।

অতএব, অন্যান্য বিষয়ের মতো *জিম্মিদের* ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র দায়িত্বশীল, তারা নাগরিকত্বের অধিকারসমূহ, নিরাপত্তা, বসবাসের নিশ্চয়তা এবং ন্যায়বিচার ভোগ করে থাকে। এছাড়াও তাদের সাথে দয়া, ধৈর্য্য এবং ক্ষমাশীল আচরন করতে হবে। তারা চাইলে ইসলামী সামরিক বাহিনীতে যোগদান করতে পারে এবং মুসলিমদের পাশে থেকে যুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু তারা যুদ্ধ করতে এবং *জিযিয়া* ব্যতিরেকে সম্পদ প্রদান করতে বাধ্য নয়, সুতরাং এক্ষেত্রে মুসলিমদের উপর যে কর বাধ্যতামূলকভাবে আরোপ করা হয়, অমুসলিমদের উপর সেধরনের কোন কর ধার্য্য করা হয় না। *জিম্মিদের* বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এবং লেনদেন ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করে শাসক এবং বিচারকগণ *জিম্মিদের* প্রতি মুসলিমদের মতো একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। সুতরাং মুসলিমদের মতো *জিম্মিরাও* সমভাবে একই অধিকার ভোগ করে থাকে এবং এটা তাদের কাছ থেকে আশা করা হয় যে, তারাও তাদের উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবে, উদাহরণস্বরূপ: ওয়াদা পূরন ও রাষ্ট্রের আদেশ পালন।

এটাকে এভাবে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বহনকারীদের বিষয়াদিসমূহ যথাযথভাবে দেখাশোনা করা হবে এবং এক্ষেত্রে তারা মুসলিম নাকি অমুসলিম সেটা কোন বিচার্য বিষয় নয়। যারা ইসলামী নাগরিকত্ব অর্জন করবে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরন করা নিষিদ্ধ, কারন শাসন ও বিচার এবং বিষয়াদি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দলিল-প্রমানসমূহের সার্বজনীনতা এটাই নির্দেশ করে। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"আর যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়-ভিত্তিক বিচার করবে"*** (নিসা: ৪৮)। এটা একটা সাধারণ নির্দেশনা যা মুসলিম ও অমুসলিম সকল মানুষের উপর প্রযোজ্য। এছাড়াও, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: ***"বাদীকে অবশ্যই উপযুক্ত প্রমান দাখিল করতে হবে এবং অভিযোগ অস্বীকারকারী বিবাদীকে অবশ্যই ওয়াদা করতে হবে"***, সহীহ্ সনদ সহকারে আল-বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত। এটাও সার্বজনীন এবং মুসলিম-অমুসলিম সবার উপরে প্রযোজ্য। আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের হতে বর্ণিত আছে: ***"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আদেশ দিয়েছেন যে, বিবাদে লিপ্ত পক্ষসমূহকে অবশ্যই বিচারকের সামনে বসতে হবে"***, আহমেদ ও আবু-দাউদ কর্তৃক বর্ণিত ও আল-হাকিম কর্তৃক স্বীকৃত। এটাও সার্বজনীন এবং এর মধ্যে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় পক্ষই অন্তর্ভূক্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: ***"ইমাম হচ্ছে অভিভাবক এবং সে তার আওতাধীন নাগরিকদের জন্য দায়িত্বশীল"*** (মুসলিম এবং বুখারী উভয়ে একমত)। এখানে "নাগরিক" শব্দটি সার্বজনীন এবং এর মধ্যে মুসলিম ও অমুসলিম অন্তর্ভূক্ত। একইভাবে, নাগরিকত্বের সাথে সম্পর্কিত সকল সাধারন দলিলসমূহ নির্দেশ করে যে, মুসলিম ও অমুসলিম, আরব ও অনারব এবং সাদা ও কালোর ক্ষেত্রে কোন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরন করা নিষিদ্ধ। বরং, ইসলামী নাগরিকত্ব বহনকারী সকল ব্যক্তির বিষয়াদি দেখাশোনার কাজে ও তাদের জীবনের,

সম্মানের ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে শাসক, কিংবা ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে বিচারক, কোনরূপ বৈষম্য না করে সকলের ক্ষেত্রে সমান আচরণ করবে।

ধারা ৭

মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য না করে রাষ্ট্র নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর ইসলামী *শরীয়াহ্* বাস্তবায়ন করবে ঃ

ক) কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই মুসলিমদের উপর ইসলামের সকল বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করা হবে।

খ) সাধারন ব্যবস্থার আওতায় অমুসলিমদেরকে তাদের বিশ্বাস অনুসরনের ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের অনুমতি দেয়া হবে।

গ) ইসলামধর্ম ত্যাগকারীরা যদি নিজেরাই ধর্মত্যাগী হয়ে থাকে তবে তাদের উপর ধর্মত্যাগের বিধান কার্যকর করা হবে। যদি তাদের পূর্বপুরুষ মুরতাদ হয়ে থাকে এবং তারা অমুসলিম হিসাবে জন্মগ্রহণ করে থাকে, তবে তারা অমুসলিম হিসাবেই বিবেচিত হবে। অতএব, বাস্তবতা ভেদে তাদের সাথে হয় মুশরিক নতুবা আহ্লে কিতাবের অনুসারীদের মতো আচরন করা হবে।

ঘ) *শরীয়াহ্* বিধানের আওতার মধ্যে অমুসলিমরা খাদ্যদ্রব্যাদি ও পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে নিজেদের বিশ্বাসকে অনুসরন করতে পারবে।

ঙ) অমুসলিমদের মধ্যে বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত সকল বিষয় তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে, এবং মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে এ সকল বিষয় ইসলামের বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

চ) উপরোক্ত বিষয়সমূহ ব্যতীত অন্যান্য সকল *শরীয়াহ্* সম্পর্কিত বিষয় এবং বিধিবিধান, যেমনঃ লেনদেন, দন্ডবিধি, সাক্ষ্য, শাসন ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির মতো সকল শরীয়াহ্গত বিষয়াদিতে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সবার উপর সমভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। চুক্তিবদ্ধ মানুষ, আশ্রয়-প্রার্থী, এবং ইসলামের অধীনস্ত সকলের উপর রাষ্ট্র একই শরীয়াহ্ আইন বাস্তবায়ন করবে। রাষ্ট্র সমাজের সকল মানুষের উপর *শরীয়াহ্* বাস্তবায়ন করবে, তবে অন্য দেশের রাষ্ট্রদূত, কুটনৈতিক প্রতিনিধি এবং একই ধরনের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এর আওতামুক্ত থাকবে, কারণ তাদের কুটনৈতিক দায়মুক্তি প্রযোজ্য হবে।

নিশ্চয়ই ইসলাম সকল মানুষের জন্য এসেছে। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"আর আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি"*** (সূরা সাবা: ২৮)। যেরকমভাবে একজন অবিশ্বাসীও *"উসুল"* (মূলনীতিসমূহ) কিংবা, ভিন্ন শব্দে ইসলামিক *'আক্বীদা* মেনে চলতে বাধ্য, সেরকমভাবে সে আনুসঙ্গিক হুকুমসমূহ, তথা শরীয়াহ্ বিধানসমূহ মেনে নিতেও বাধ্য। বিধানসমূহ মেনে নিতে যে সে বাধ্য তা পবিত্র কুরআনে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং এগুলোর সাথে সাথে আনুসঙ্গিক হুকুমগুলো মেনে নিতেও সে বাধ্য। কারণ আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) পরিষ্কারভাবে তাকে কিছু আনুসঙ্গিক হুকুম বাধ্যতামূলকভাবে মানতে বলেছেন, সেগুলোর মধ্যে কিছু আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ্র ইবাদত করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর"*** (বাকারা-২১), তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেছেন: ***"আল্লাহ্র জন্য হজ্জ করা মানুষের উপর ফরয দায়িত্ব"*** (আল ইমরান-৯৭), এবং এ ধরনের আরও আয়াত রয়েছে। এছাড়াও, অবিশ্বাসীরা যদি আনুসঙ্গিক হুকুমসমূহ মেনে চলতে বাধ্য না হতো তবে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদেরকে দায়িত্ব পালন না করার জন্য সতর্ক করতেন না; এবং এসকল দায়িত্ব পরিত্যাগের সাথে সম্পর্কিত অনেক আয়াত রয়েছে, এগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি নিম্নরূপঃ

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেনঃ ***"আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ; যারা যাকাত দেয় না"*** (হা-মীম আস-সাজদা: ৬-৭)।

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেনঃ ***"আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা হারাম করেছেন, সঙ্গত কারন ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না; আর যে এরূপ করবে সে তো কঠিন আযাবের সম্মুখিন হবেই"*** (ফুরকান ঃ ৬৮)।

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেনঃ ***"কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে যেঃ আমরা সালাত আদায়কারী ছিলাম না"*** (মুদাচ্ছির ঃ ৪২-৪৩)।

মূল কথা হচ্ছে, অবিশ্বাসীরা কিছু আদেশ-নিষেধ পালন করতে বাধ্য- এ বক্তব্যটি এটাই নির্দেশ করে যে, তারা সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলতেও বাধ্য। এছাড়াও, যেসব আয়াতে আনুসঙ্গিক হুকুমসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে বলা হয়েছে সেসব আয়াতে শব্দগুলো সাধারনভাবে এসেছে এবং এগুলোর অর্থ সাধারনই থাকবে, যদি না সুনির্দিষ্টকরনের দলিল উল্লেখ করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে এরকম কোন প্রমান নেই যে আয়াতগুলো শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য, বরং এগুলো সাধারণ হিসেবেই বিবেচিত হবে। উদাহরণস্বরূপ: আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন"*** (বাকারা-২৭৫), এবং আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"এবং যদি তারা তোমার সন্তানদের দুগ্ধপান করায়, তবে তাদেরকে তাদের পাওনা দিয়ে দাও"*** (তালাক: ৬), আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন: ***"তখন বন্ধকী বস্তু হস্তগত করা..."*** (বাকারা-২৮৩), এবং যাবির হতে সহীহ্ সনদ সহকারে আহ্‌মেদ ও আল-তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: ***"যে একটি অনুর্বর জমি পুনরুজ্জীবিত করবে, সেটা তার হয়ে যাবে"***। সামুরাহ্ বিন মানছুর হতে সহীহ্ সনদ সহকারে আহ্‌মেদ কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: ***"যেটা নেয়া হয়েছে সেটার জন্য হাত দায়ী থাকবে, যতক্ষন পর্যন্ত না তা ফেরত দেয়া হয়"***। এই আয়াত ও হাদিসগুলো পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, তারা আনুসঙ্গিক হুকুমসমূহ মেনে চলতেও বাধ্য।

এছাড়াও, মৌলিক বিষয়গুলো মেনে চলার বাধ্যবাধকতার আদেশটি নিজেই আনুসঙ্গিক হুকুমগুলো মেনে চলার বাধ্যবাধকতার দলিল এবং সম্পূর্ণরূপে মেনে চলার বাধ্যবাধকতার আদেশটি অন্যান্য অংশগুলো মেনে চলার আদেশও বটে। অতএব নামায পড়ার বাধ্যবাধকতার মধ্যে সিজদা করা, তেলাওয়াত করা, দাঁড়ানো ইত্যাদি বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভূক্ত। একজন অবিশ্বাসী মূল ভিত্তিগুলো মেনে নিতে বাধ্য, অতএব সে আনুসঙ্গিক হুকুমসমূহ মেনে চলতেও বাধ্য। তবে নামায ও রোযার মতো হুকুমসমূহ অবিশ্বাসীরা পালন করলেও তা কবুল হবে না, কারন এগুলো কবুল হওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণ পূর্বশর্ত, অতএব শর্তটি পূরন না হলে এগুলো গ্রহণ করা হবে না। যাহোক, এর অর্থ এটা নয় যে এগুলো পালন করার বিষয়ে তারা দায়বদ্ধ নয়। তবে তাদেরকে জিহাদের মতো সুনির্দিষ্ট কিছু আনুসঙ্গিক হুকুম পালন করার আদেশ দেয়া হয়নি এবং সেগুলোর সাথে ইসলাম গ্রহণের কোন শর্তও আরোপ করা হয়নি, এর মূল কারণ হচ্ছে, অবিশ্বাসীদের সাথে তাদের অবিশ্বাসের কারণে লড়াই করাকে জিহাদ বলে, আর *জিম্মি* হচ্ছে একজন অবিশ্বাসী, অতএব অবিশ্বাসীদের জন্য এটা ধারনাতীত যে, তারা অবিশ্বাসীদের সাথে তাদের অবিশ্বাসের কারণে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তবে নিজের মতো করে যুদ্ধে অংশগ্রহন করা তার জন্য অনুমোদিত হতে পারে। অতএব, যুদ্ধে অংশগ্রহন করা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। যদি সে অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধে যোগদান করতে সম্মত হয় তবে তাকে তা করতে দেয়া হবে। অতএব, জিহাদে যোগদানের জন্য তাকে কোনরূপ জোড়-জবরদস্তি করা হবে না এবং এর মানে এটা নয় যে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাকে এটা করার নির্দেশ দেননি।

একারনে তারা ইসলামের বিধি-বিধান মেনে নিতে বাধ্য। শাসকদেরও যে তাদের উপর সকল ইসলামী বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা উচিত সে বিষয়ে কিতাবধারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বানী হতে নির্দেশনা পাওয়া যায়: ***"সুতরাং আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করুন আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে সেটা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না"*** (মায়িদাহ্: ৪৮)।

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদের ব্যাপারে আরও বলেছেন: ***"আর আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করুন আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না"*** (মায়িদাহ্: ৪৯)।

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেছেন ঃ ***"নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি মানুষের মধ্যে সে অনুসারে বিচার ফয়সালা করেন যা আল্লাহ্ আপনাকে জানিয়েছেন"*** (নিসা: ১০৫)।

এটা একটা সাধারন আহ্বান যা মুসলিম-অমুসলিম সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে, কারণ ***"যাতে আপনি মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা..."***- আয়াতটির মধ্যে ***"মানুষ"*** শব্দটি সাধারণভাবে এসেছে। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন: ***"তারা মিথ্যা শুনতে অভ্যস্ত, হারাম ভক্ষনে অত্যন্ত আসক্ত, সুতরাং তারা যদি আপনার কাছে আসে তবে তাদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করে দিন অথবা তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন"***, এর অর্থ হচ্ছে: ভিন্ন রাষ্ট্র থেকে যদি কোন অবিশ্বাসী ইসলামী রাষ্ট্রে এসে অন্য অবিশ্বাসীর সাথে কোন ধরনের বিরোধ নিস্পত্তির জন্য মুসলিমদের মধ্যস্থতা চায় তবে এক্ষেত্রে মুসলিমরা বিচার-ফয়সালা করে দিতে পারে বা এ থেকে বিরত থাকতে পারে। এই আয়াতটি মদীনার ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল করা হয়েছিল, যাদের সথে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) শান্তি স্থাপন করেছিলেন এবং চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। তারা ভিন্ন গোত্র হিসেবে বসবাস করত এবং ভিন্ন রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হত। তারা ইসলামী শাসনের অধীন ছিল না, বরং তারা ভিন্ন রাষ্ট্রের অধীনে ছিল, তাই তিনি (সাঃ) তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। যাহোক, যদি তারা *জিম্মিদের* মতো ইসলামের অধীনে থাকত অথবা যদি তারা আশ্রয়প্রার্থী হতো, তবে তাদের মধ্যে ইসলাম ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারা বিরোধের নিস্পত্তি করা নিষিদ্ধ হতো। যদি কেউ ইসলামী বিধানকে মেনে নিতে অস্বীকার করত তবে শাসক তাকে তা মানতে বাধ্য করত এবং এরজন্য তাকে শাস্তি প্রদান করত।

দুটি শর্ত পূরন করা না হলে অবিশ্বাসীদের সাথে কোন ধরনের অনির্দিষ্ট *জিম্মাহ্* শপথে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ। প্রথমত: প্রত্যেক বছর *জিম্মি জিযিয়া* প্রদান করবে, এবং দ্বিতীয়ত: তারা ইসলামী বিধি-বিধান মেনে চলবে; এর অর্থ হচ্ছে, আদেশ পালন ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে তাদের উপর যা বাস্তবায়িত করা হবে তা গ্রহন করে নেয়া। এর কারণ হলো, আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন: ***"যতক্ষন পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার করে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে"*** (তওবা ঃ ২৯), অর্থাৎ যতক্ষন পর্যন্ত না তারা ইসলামী শাসনের কাছে নিজেদের সমর্পন করে। রাসুলুল্লাহ্ও (সাঃ) তাদের উপর ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়িত করেছিলেন। ইবনে উমর হতে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন: ***"ইহুদীরা তাদের মধ্য হতে যেনাকারী একজন পুরুষ ও একজন নারীকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এসেছিল এবং তিনি (সাঃ) তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার নির্দেশ দেন"***, এবং আনাস হতে আল-বুখারী বর্ননা করেছেন: ***"রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) একজন ইহুদীকে হত্যার নির্দেশ দেন, কারন সে গহনার জন্য একজন নারীকে হত্যা করেছিল"***। এই ইহুদীরা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্ত ছিল। এছাড়াও, আল শুবাহ্ হতে ইবনে আবু শায়বাহ্ কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নাজরানের খ্রিষ্টান অধিবাসীদের নিকট একটি চিঠি লিখেছিলেন, সেটাতে উল্লেখ ছিল: ***"তোমাদের মধ্যে যে সুদের ভিত্তিতে লেনদেন করল সে জিম্মাহ্র শপথ অস্বীকার করল"*** (মুরসাল বর্ণনা)। এ সবকিছুই কোনরূপ পার্থক্য ব্যতিরেকে মুসলিম ও অমুসলিম সকলের উপর ইসলামের সকল বিধি-বিধান বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতার বিষয়ে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে। এর ভিত্তিতেই এই ধারার " অনুচ্ছেদ ক" সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ "খ"-এর ক্ষেত্রে: ইসলামের সকল বিধান বাস্তবায়নের সাধারণ আদেশ সম্পর্কে আল্লাহ্র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বানীতে উল্লেখ আছে যে: ***"এবং আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করুন আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে"*** (মায়িদাহ্ ঃ ৪৮)। এই সাধারণ হুকুমটি *শরীয়াহ্* কর্তৃক সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে; তাদের *আক্বীদা* বা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত সাধারন নিয়ম-কানুন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন কাজের সাথে সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাদের আক্বীদা এবং এই নিয়মকানুনসমুহ পরিষ্কার দলিলের মাধ্যমে ইসলাম কর্তৃক ব্যতিক্রম হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোড়-জবরদস্তি নেই"*** (বাক্বারা: ২৫৬), এবং উরওয়াহ্ হতে আবু উবায়েদ কর্তৃক *আল-আনওয়ালে* বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: ***"যে ইহুদী ধর্মমত গ্রহন করেছে এবং যে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহন করেছে তাকে তার বিশ্বাস পরিত্যাগে বাধ্য করা যাবে না এবং তাকে অবশ্যই জিযিয়া প্রদান করতে হবে"***। অতএব, যে কাজগুলো তাদের বিশ্বাসের বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত, সেগুলো পালনের ক্ষেত্রে আমাদের বাধা দেয়া উচিত নয় এবং তাদেরকে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে দেয়া উচিত, যদিওবা সেগুলো আমাদের *দ্বীনের* মধ্যে *আক্বীদা* সংক্রান্ত বিষয় না হয়ে থাকে। সেই সাথে, তাদের যে কাজগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অনুমোদন দিয়েছেন সেগুলো করতে চাইলে আমাদের বাধা দেয়া উচিত নয়, যেমন: মদ্যপান এবং বিবাহ, তবে এগুলো সাধারন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত হতে হবে। ভিন্নভাবে বলা যায় যে, তারা তাদের ব্যক্তিগত জায়গায় মদপান করতে পারবে, কিন্তু বাজার বা বাজারের মতো জায়গায়, যেখানে তারা মুসলিমদের সাথে বিভিন্ন কাজে মেলামেশা করে সেখানে মদপান করতে পারবে না।

এই ধারার "গ" অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে: ধর্মত্যাগীদের বিষয়ে ইসলাম সুনির্দিষ্ট হুকুম প্রদান করেছে। যদি ধর্মত্যাগী পুরুষ বা নারী তওবা না করে তবে তাকে হত্যা করতে হবে, কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: ***"যে দ্বীন পরিত্যাগ করবে তাকে হত্যা কর"*** (ইবনে আব্বাস হতে আল-বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)। আনাস বর্ণনা করেছেন: ***"আমি উমরের কাছে আসলে তিনি বল্লেন: হে আনাস! বকর ইবনে ওয়াইল-এর ছয়জন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি ঘটেছিল? আমি বলেছিলাম: হে বিশ্বাসীদের আমীর, তাদেরকে একটি যুদ্ধে হত্যা করা হয়েছিল, এর পরে উমর আল্লাহ্‌র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বাণী পাঠ করলেন: "আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আমরা এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাবো", সুতরাং আমি বলেছিলাম: "তাদেরকে কি মৃত্যু ব্যতিত অন্য কোন কিছু দিয়ে মোকাবিলা করা যেত? তিনি বল্লেন: "হ্যা, আমি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতাম, যদি তারা প্রত্যাখ্যান করত তবে তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করতাম"*** (বাইহাকি কর্তৃক বর্ণিত)। ভিন্ন শব্দে, যতক্ষন পর্যন্ত না তারা তাওবা করে এবং যদি তারা তা না করে তবে তাদেরকে হত্যা করা হত। কারণ ধর্মত্যাগীকে ইসলাম গ্রহনের আহ্বান জানানো হবে এবং এক্ষেত্রে সকল ধরনের প্রচেষ্টা করতে হবে, এবং এরপরেও যদি সে প্রত্যাখ্যান করে তবে তাকে হত্যা করা হবে। একজন ধর্মত্যাগীকে শুধুমাত্র ধর্মত্যাগের কারণে হত্যা করা যাবে না, কারণ যাবের হতে বর্ণিত আছে যে: ***"উম্মে মারওয়ান নামে একজন মহিলা ধর্মত্যাগ করে, সুতরাং আল্লাহ্ তার সামনে ইসলাম উপস্থাপনের আদেশ দেন. এবং এরপর যদি সে তওবা করে (তবে তা গ্রহন করা হবে) এবং অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে"***, আল-বাইহাকি ও দারাকুটনি কর্তৃক বর্ণিত। বহু সংখ্যক *ফুকা'হা* কর্তৃক এই বর্ণনাটি ব্যবহৃত হয়েছে;- ইবনে কুদামাহ্ এটাকে দলিল হিসেবে *আল-মুগনিতে* ব্যবহার করেছেন, আল-মাওয়ারদি *আল-হাওয়ি আল-কাবিরে* এবং *আল-আহ্‌কাম আল সুলতানিয়াহ্‌তে*, আবু ইসহাক্ আল-সিরাজি এটাকে *আল-মুহাদ্দাবে*, আল-রাফি *আল-শারাহ্ আল-কাবিরে*, আল-বাঘাওয়ি আল-তাধ্‌হিব-এ, এবং ইবনে আল-যাওবিন *আল-তাহ্‌কিক্*-এ এটাকে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং এটিকে হাসান (গ্রহনযোগ্য) হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এর ভিত্তিতে কাজ করা হয়- ভিন্ন শব্দে, মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পূর্বে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

"গ" অনুচ্ছেদের হুকুমটি শুধুমাত্র ধর্মত্যাগী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; এগুলো তার সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যাহোক, যদি কোন মুসলিম ধর্মত্যাগ করে এবং অন্য ধর্ম গ্রহন করে সেটার উপর অধিষ্ঠিত থাকে, উদাহরনস্বরূপ: যদি সে খ্রিষ্টান, ইহুদী বা মুশরিক হয়ে যায় এবং এরপর তার সন্তান হলে যদি সেই সন্তান একই বিশ্বাস ধারন করে তবে সন্তানটি কি ধর্মত্যাগী হিসেবে পরিগণিত হবে? তাদের সাথে কি ধর্মত্যাগীর মতো একই আচরন করা হবে? অথবা, তারা কি জন্মকালীন সময়ের বিশ্বাস অনুযায়ী বিবেচিত হবে?

এর উত্তর হচ্ছে: এটা সন্দেহাতীত যে, যদি কোন সন্তান তার পিতার ধর্ম ত্যাগের পূর্বেই জন্মগ্রহণ করে থাকে তবে সে মুসলিম হিসেবে গন্য হবে। কিন্তু যদি তারা তাদের পিতাকে অনুসরণ করে এবং ধর্মত্যাগী হয় তবে তারাও ধর্মত্যাগী হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি পিতার ধর্ম ত্যাগের পরে একজন অবিশ্বাসী বা ধর্মত্যাগী স্ত্রীর গর্ভ হতে তাদের জন্ম হয় তবে তারা অবিশ্বাসী হিসেবে গণ্য হবে, ধর্মত্যাগী হিসেবে নয়; অতএব তারা জন্মের সময় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানুষদের মতোই বিবেচিত হবে। তাই পিতা ধর্মত্যাগী হওয়ার পরে একজন অবিশ্বাসী বা ধর্মত্যাগী স্ত্রীর গর্ভ হতে জন্মগ্রহণ করা শিশু অবিশ্বাসী হিসেবে বিবেচিত হবে, কারণ শিশুটি দু'জন অবিশ্বাসী পিতামাতা হতে জন্মগ্রহন করেছে। অতএব যদি পিতামাতা ইহুদী কিংবা খ্রিষ্টান হয়ে যায়, অর্থাৎ কিতাবধারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়, তবে জন্মগ্রহনকৃত শিশুটির সাথে কিতাবধারীদের মতো আচরন করা হবে এবং যদি পিতামাতা মুশরিক হয়ে যায় তবে জন্মগ্রহণকৃত শিশুটি মুশরিক হিসেবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে হুকুম এরকমই, কারণ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন: ***"যখন আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) তোমার পিতাকে (উকবা ইবনে আবু মুইত) মৃত্যুদন্ড দিতে চেয়েছিলেন, তখন পরবর্তীজন বলেছিল যে: "সন্তানদের ব্যাপারে কি হবে?" তিনি (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন: "জাহান্নামের আগুন"*** (আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত, আল-হাকিম এটাকে অনুমোদন দিয়েছেন এবং আল-ধাহাবি তার সাথে একমত পোষণ করেছেন)। আল-দারাকুটনির বর্ণনায় আছে যে: ***"তাদের জন্য ও তাদের পিতার জন্য জাহান্নামের আগুন"***। এছাড়াও এটি সহীহ্ আল-বুখারীতে আবাসস্থলের বাসিন্দাদের অধ্যায়ে জিহাদের বইয়ে উল্লেখ রয়েছে যে: ***"আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) আল-আবওয়া- অথবা বিওয়াদ্দান- অতিক্রম করেছিলেন এবং তাকে (সাঃ) সেইসব স্বজন, নারী এবং মুশরিকদের পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যাদেরকে তাদের পিতাদের সহিত হত্যা করা হয়েছিল; তিনি (সাঃ) বলেছিলেন: তারা তাদের অন্তর্ভূক্ত"***, অতএব অবিশ্বাসী পিতামাতা হতে জন্মগ্রহনকারী শিশুরাও অবিশ্বাসী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং অবিশ্বাসীদের বিষয়ে যেসব হুকুম রয়েছে সেসব তাদের উপর প্রযোজ্য হবে।

আর যারা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে অমুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়, যেমন: দ্রুয, বাহাই, কাদিয়ানি বা এ ধরনের অন্য কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়, তবে তারা ধর্মত্যাগী হিসেবে গণ্য হবে না, কারণ তারা ধর্মত্যাগী হয়নি বরং তাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মত্যাগী হয়েছিল এবং তারা দুজন অবিশ্বাসী পিতামাতা হতে জন্মগ্রহন করেছিল। অতএব তারা অবিশ্বাসী হিসেবে গন্য হবে এবং তাদের সাথে অবিশ্বাসীদের মতো একই আচরন করা

হবে। উপরন্তু, যেহেতু তারা কিতাবধারীদের মধ্য হতে কোন ধর্ম গ্রহণ করেনি, অর্থাৎ তারা ধর্মত্যাগী হয়ে খ্রিষ্ট বা ইহুদী ধর্মমত গ্রহণ করেনি, সেহেতু তারা মুশরিক হিসেবে পরিগনিত হবে। অতএব, তাদের দ্বারা জবেহ্কৃত গোশত খাওয়া যাবে না এবং তাদের নারীদেরকে বিবাহ করা যাবে না, কারণ অমুসলিমরা হয় কিতাবধারী নতুবা মুশরিক হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তৃতীয় কোন শ্রেণী নেই, আল-হাসান বিন মুহাম্মদ বিন আল-হানাফিইয়াহ্-এর বর্ণনা মোতাবেক, একারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাজার্-এর প্রাচীন পারসিক পুরোহিতমন্ডলী সম্পর্কে বলেছিলেন: ***"যারা ইসলাম গ্রহন করবে তাদের গ্রহন কর এবং যারা বিরত থাকবে তাদের উপর জিযিয়া আরোপ কর, কিন্তু তাদের নারীদের বিয়ে করো না কিংবা তাদের জবেহ্কৃত গোশত খেও না"*** (*আল-দিরাইয়াহ্*তে আল-হাফিজ বলেছেন: "আবু আল-রাজ্জাক এবং ইবনে আবি শায়বাহ্ কর্তৃক বর্ণিত এবং ভালো সনদ সহকারে এটি একটি মুরসাল বর্ণনা")। যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে যায়- লেবাননের শিহাব পরিবারের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল; এই পরিবারের পূর্বপুরুষেরা মুসলিম ছিল এবং তারা ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে এবং তাদের সন্তানেরাও খ্রিষ্টান হিসেবে জন্মগ্রহন করে- তবে এই ধরনের মানুষেরা এবং তাদের মতো অন্যরা কিতাবধারীদের অন্তর্ভূক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

'ঘ' এবং 'ঙ' অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে: আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে মদপানের অনুমতি দিয়েছেন এবং তাদের বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের নিয়মকানুনকে অনুমোদন দিয়েছেন- এটা থেকেই অনুচ্ছেদ দুটির দলিল উদ্ভূত হয়েছে। ফলে তাঁর (সাঃ) অনুমোদনটি সাধারণ হুকুমের একটি সুনির্দিষ্ট বিবরণী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে অবিশ্বাসীদের বিবাহের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুমোদন শুধুমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন বর-কনে দুজনেই অবিশ্বাসী হয়, কিন্তু যদি বর মুসলিম হয় এবং কনে খ্রিষ্টান বা ইহুদী হয় তাহলে *শরীয়াহ্র* বিধিবিধান দুজনের উপরেই প্রযোজ্য হবে। এটা হতে পারবে না যে, কনে মুসলিম হবে এবং বর অমুসলিম হবে, কারণ এটা অনুমোদিত নয়। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"যদি তোমরা জানতে পার যে তারা ঈমানদার তবে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না। তারা কাফেরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফেররাও তাদের জন্য হালাল নয়"*** (মুমতাহিনা: ১০)। অতএব, একজন মুসলিম নারীর জন্য অমুসলিম কাউকে বিয়ে করা হারাম এবং যদি সে এটা করে তবে তা বেআইনী হবে।

'চ' অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে: অবিশ্বাসীরা সকল বুনিয়াদি ও আনুসঙ্গিক হুকুম মানতে বাধ্য, এ বিষয়ে উপরে উল্লেখিত আলোচনা থেকে ইসলামের সকল বিধিবিধান বাস্তবায়নের দলিল উদ্ভুত হয়েছে, অতএব তাকে ইসলামের সকল হুকুমের প্রতি নিজেকে সমর্পনের আদেশ দেয়া হয়েছে, এবং এর মধ্যে ইসলামের অধীনে বসবাসকারী সকল *জিম্মি* ও *জিম্মি* ব্যতিত অন্যান্য মানুষ অন্তর্ভূক্ত। অতএব *দার আল-ইসলামে* প্রবেশকারী অবিশ্বাসীদেরকে *আক্বীদা* সম্পর্কিত নিয়মকানুন এবং রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক অনুমোদিত কাজসমূহ ব্যতিত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধান মানতে হবে, এক্ষেত্রে অবিশ্বাসীরা হতে পারে *জিম্মি*, চুক্তির অধীন কিংবা আশ্রয়প্রার্থী। যাহোক, রাষ্ট্রদূতেরা বা তাদের মতো ব্যক্তিরা এই নিয়েমের অন্তর্ভূক্ত নয় এবং তাদের উপর ইসলামের বিধিবিধান কার্যকর করা হবে না, কারন তাদেরকে কুটনৈতিক দায়মুক্তি প্রদান করা হবে। এর কারণ হচ্ছে, আবু ওয়াইল হতে আহ্মেদ কর্তৃক বর্ণিত আছে যে: ***"ইবনে নাওয়াহা এবং ইবনে উথাল রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে মিথ্যাবাদী মুসায়লামার দূত হিসেবে এসেছিল এবং রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে বলেছিলেন: "তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহ্র রাসূল?" তারা বলেছিল: "আমরা সাক্ষ্য দেই যে মুসায়লামা আল্লাহ্র রাসূল", এর প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: "আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে নিরাপত্তা দিয়েছি। যদি আমি কোন দূতকে হত্যার ব্যাপারে আদিষ্ট হতাম তবে তোমাদের দুজনকে হত্যা করতাম"*** (আহ্মেদ কর্তৃক বর্ণিত এবং আল-হাইথামি কর্তৃক হাসান হিসেবে ঘোষিত)। সুতরাং এই বর্ণনাটি এটাই নির্দেশ করে যে, অবিশ্বাসীদের প্রেরিত দূতকে হত্যা করা যাবে না এবং তাদের উপর শাস্তি (*উকুবাত*) আরোপ করা যাবে না। যাহোক, এটা বিশেষভাবে শুধুমাত্র দূত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেমন: রাষ্ট্রদূত এবং "চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স"- এর মতো ব্যক্তি। কিন্তু, দূত হওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন না হলে তারা কোন ধরনের দায়মুক্তি পাবে না, যেমন: কনসাল বা প্রতিনিধি এবং বাণিজ্যিক অ্যাটাশে, কারণ এ ধরনের ব্যক্তিরা দূত হওয়ার যোগ্যতা বহন করে না। এ বিষয়টি আন্তর্জাতিক রীতি-রেওয়াজের উপর ন্যস্ত করা উচিত, কারণ এটা একটি শাব্দিক প্রকাশ, যার বাস্তবতা প্রচলিত রীতি বিশ্লেষণ করে বুঝতে হবে এবং এটা *মানাত* (বাস্তবতা) নির্ধারনের একটি অংশ; ভিন্ন শব্দে, তারা আদৌ দূত হিসেবে বিবেচিত হবে কিনা তা নির্ধারন করতে হবে।

ধারা ৮

বিশেষভাবে আরবী হচ্ছে ইসলামের ভাষা এবং আরবীই হবে রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবহৃত একমাত্র ভাষা।

এই ধারার স্বপক্ষের দলিল এই বিষয়টি হতে উদ্ভুত হয়েছে যে, যদিও কুরআন সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করে নাযিল করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন: ***"আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপমা বর্ণনা করেছি"*** (বণী-ইসরাঈল: ৮৯), ***"এবং আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি"*** (রুম: ৫৮), তথাপি আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এটাকে আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন এবং আরবী কুরআন হিসেবে তৈরী করেছেন। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন, ***"আরবী ভাষায় কুরআনরূপে"*** (ইউসুফ: ২) এবং আল্লাহ্ (সুবানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন, ***"(তা নাযিল করা হয়েছে) পরিষ্কার আরবী ভাষায়"*** (শু'আরা ঃ ১৯৫)।

অতএব, আরবী হচ্ছে ইসলামের একমাত্র ভাষা, কারণ এটা কুরআনের একমাত্র ভাষা এবং কুরআন হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অলৌকিক বিষয় (*আল-মুযিজাহ্*)। আরবী শব্দের মাধ্যমে কুরআনের এই বিশেষ প্রকাশভঙ্গিতেই কুরআনের অলৌকিকত্ব নিহিত রয়েছে; ভিন্নভাবে বলা যেতে পারে যে, আরবী শব্দ ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যেই অলৌকিকত্ব নিহিত। যদিও অবিচ্ছেদ্যভাবে শব্দ এবং অর্থ উভয়ের মধ্যে অলৌকিকত্ব খুজে পাওয়া যায়। অর্থের মধ্যে অলৌকিকত্ব মানে এটা নয় যে, কুরআন অর্থ এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যা আনয়ন করেছে তা অলৌকিক, কারণ সুন্নাহ্ এসব অর্থ ও বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করেছে এবং এটা অলৌকিক হিসেবে বিবেচিত হয় না। অর্থের দিক দিয়ে অলৌকিকত্ব এভাবে রূপায়িত হয়েছে যে, ব্যবহৃত শব্দ এবং এর প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে অর্থটি প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, এই বিশেষ শব্দসমষ্টি এবং বিশেষ প্রকাশভঙ্গিই অলৌকিক, যার মাধ্যমে শব্দসমূহের অর্থ প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য, আরবী শব্দসমষ্টির মাঝে অলৌকিকত্ব নিহিত রয়েছে যা বিশেষ প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে অর্থকে প্রকাশ করে। ভিন্নভাবে, আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"যদি আপনি কোন সম্প্রদায় থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করেন তবে আপনিও তাদের চুক্তি তাদের দিকে সমভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন"*** (আনফাল ঃ ৫৮), আর এ ধরনের আয়াত তৈরী করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। শব্দ সমষ্টির এই বিশেষ গঠনপ্রণালী ও প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে এর অর্থসমূহ প্রকাশের মধ্যে যে জৌলুস বা ঐশ্বর্য রয়েছে সেটা থেকেই এর অলৌকিকত্ব এসেছে। অতএব, আরবী শব্দসমষ্টি ও আরবী প্রকাশভঙ্গিই হচ্ছে অলৌকিক যা এর অর্থসমূহ প্রকাশ করে। সেজন্যই কুরআনের অলৌকিকত্ব আরবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কারণ এটাই এই অলৌকিকত্বের উৎস এবং এর চ্যালেঞ্জের বিষয়বস্তু হচ্ছে এটার মতো একইরকম কোনকিছু সৃষ্টির আহ্বান। অতএব, আরবী কুরআনের অবিচ্ছেদ্য অংশ যা এর থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। আরবীকে বাদ দিয়ে কুরআন নিজেই কুরআন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। তাই কুরআন অনুবাদ করা নিষিদ্ধ, কারণ যদি এটাকে পরিবর্তন করা হয়, তবে এটা তার ক্রমবিন্যাস হারিয়ে ফেলবে এবং এটা আর কুরআন থাকবে না, বা কুরআনের মতো কোন কিছু হবে না; বরং, অনুবাদ করা হলে তা হবে শুধুমাত্র এর ভাষ্য এবং এই অনুদিত ভাষ্য যদি কুরআন হিসেবে বিবেচিত হত তবে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়ার পরে মানুষ এর মতো কিছু একটা তৈরীতে ব্যর্থ হত না। এছাড়াও, আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন, ***"আরবী ভাষায় কুরআনরূপে"***, এর অর্থ হচ্ছে যে যদি এটা আরবী না হতো তবে এটাকে কুরআন বলা হত না। এছাড়াও আমরা এর শব্দসমষ্টি ব্যবহার করে আল্লাহ্র ইবাদত করি, তাই নামায এটা ছাড়া শুদ্ধ হবে না। কারণ আল্লাহ্ (সুবহানাহু তা'আলা) বলেন, ***"সুতরাং কুরআনের যতটুকু তোমাদের পক্ষে পাঠ করা সহজ ততটুকু পাঠ কর"*** (মুয্যাম্মিলঃ ২০), এবং আল্লাহ্র রাসুল (সাঃ) বলেছেন: ***"যে প্রত্যেক রাকআতে কুরআনের সুরা ফাতিহা পাঠ করবে না, তার নামায কবুল হবে না"*** (উবাদাহ্ হতে উভয়ে সম্মত)। অতএব, আরবী ইসলামের একট অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আল্লাহ্র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বক্তব্য, ***"আমার কাছে এ কুরআন প্রেরিত হয়েছে যেন আমি এর মাধ্যমে তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে ইহা পৌঁছাবে তাদের সবাইকে সতর্ক করতে পারি"*** (আনআম ঃ ১৯), এর অর্থ হচ্ছে: যাতে করে আমি কুরআনে যা আছে তার মাধ্যমে তোমাদের সতর্ক করতে পারি, এবং কুরআনের শব্দসমষ্টি এবং ভাষ্য সহকারে মানুষকে সতর্ক করার বিষয়ে এটা প্রযোজ্য এবং এর সবকিছুই সতর্ক করার বিষয় হিসেবে বিবেচিত। অপরদিকে, আল্লাহ্র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) ব্যবহৃত শব্দ ***"পড়"*** দ্বারা কুরআনের ভাষ্যের প্রতি নির্দেশ করা হয়নি কিংবা এর অনুবাদের প্রতি নির্দেশ করা হয়নি, কারন একটি বই পড়া মানে হচ্ছে বইটির মূলপাঠ পড়া, এবং অনুবাদ কিংবা ভাষ্য পড়া নয়। এজন্যই এর অর্থ কিতাবের মাধ্যমে সতর্ক করা নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে এর মূলপাঠ এবং বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সতর্ক করা। এছাড়াও, আল্লাহ্র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আদেশ মোতাবেক রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কতৃক সতর্ক করাও আরবীতে হতে হবে, কারণ আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিবরাইল একে নিয়ে এসেছেন; আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন; (তা নাযিল করা হয়েছে) পরিষ্কার আরবী***

ভাষায়" (শু'আরা ঃ ১৯৩-১৯৫)। এটা চুড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে, নামাযে সুরা ফাতিহা আরবী ব্যতিত অন্য ভাষায় পড়া নিষিদ্ধ এবং যারা আল্লাহ্‌র (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) এই আয়াতের: ***"এবং আমার কাছে এ কোরআন প্রেরিত হয়েছে"*** (আনআম ঃ ১৯) মাধ্যমে এই যুক্তি দেখায় যে, আরবীতে দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য অন্য ভাষায় সুরা ফাতিহা পড়া জায়েয, তাদের দাবিকে পূর্বের আয়াতটি বাতিল ও খণ্ডন করে দেয়।

এটা এই বাস্তবতা থেকে যে, আরবী ভাষা ইসলামের মৌলিক অংশ। কেবলমাত্র আরবীই যে রাষ্ট্রীয় ভাষা হবে সে বিষয়ে দলিল হচ্ছে, যখন রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সিজার, কিস্‌রা ও মুকাওকাস্‌-এর নিকট ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন তখন সেগুলো আরবীতে লেখা হয়েছিল, যদিও সেগুলো তাদের নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ করে পাঠানো যেত। সিজার, কিস্‌রা ও মুকাওকাস্‌ আরব ছিল না এবং যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের নিকট ইসলাম উপস্থাপনের জন্য চিঠি লিখেছিলেন তখন তিনি (সাঃ) সেগুলোকে তাদের ভাষায় লেখেননি। অতএব, এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে কেবলমাত্র আরবীই হবে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ভাষা, কারণ আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এভাবেই যোগাযোগ করেছিলেন। এছাড়াও, ইসলাম উপস্থাপনের জন্য অনুবাদ করা জরুরী হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) অনুবাদ করেননি, যা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মানুষকে ইসলামের প্রতি আহবানের ক্ষেত্রে আরবী ভাষা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতাকেই নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে যেসব মানুষকে আহ্বান করা হয়, তারা আরব নাকি অনারব সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। অতএব, সকল অনারব মানুষের আরবী ভাষা শেখা উচিত এবং রাষ্ট্রীয় ভাষা আরবী ব্যতিত অন্য কিছু হওয়া নিষিদ্ধ।

ইমাম আল-শাফি তার লেখা উসুলের (আইন বিজ্ঞানের ভিত্তিসমূহ) সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-রিসালাহ্‌তে নিম্নোক্ত রূপরেখাটি প্রদান করেছেন: *"আল্লাহ্‌ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সকল জাতির জন্য আরবী শেখাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন যাতে করে তারা কুরআন অনুসরন করতে পারে এবং এর মাধ্যমে ইবাদত করতে পারে"*।

অতএব, এসবকিছুই কেবলমাত্র আরবীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহনের বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করে।

যাহোক, এটা অবশ্যই পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে, কেবলমাত্র আরবীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহনের অর্থ এটা নয় যে, রাষ্ট্র আরবী ব্যতিত অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিকৃত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে ও বহির্বিশ্বে ইসলামের বাণী বহনে অথবা এ ধরনের কোন বিষয়ে রাষ্ট্রের জন্য অন্য কোন ভাষা ব্যবহারের অনুমোদন রয়েছে। কারণ রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হিব্রু ও সিরিয়াক্‌ ভাষা ব্যবহার করতেন। অতএব *শরীয়াহ্‌র* বিধান বলে যে, আরবী ব্যতিত অন্য ভাষা ব্যবহার হতে রাষ্ট্রকে বিরত রাখা নয় বরং রাষ্ট্রভাষা গ্রহনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আরবীকে বিবেচনা করতে হবে।

এখন যে প্রশ্নটি মনে আসে সেটি হচ্ছে: ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্ত ভূমিসমূহে লেখা ও বলার কাজে আরবী ব্যতীত অন্য ভাষার ব্যবহার অনুমোদিত হবে কি না?

এর উত্তর হচ্ছে: বলা ও লেখার কাজে অন্য ভাষার ব্যবহারের বিষয়টি রাষ্ট্রের নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে, কিংবা জনগণের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কের মধ্যে আসতে পারে, অথবা জনগণের নিজেদের মধ্যে বা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

যদি এটা রাষ্ট্রের নিজের সাথে বা নিজস্ব কাজের সাথে সম্পর্কিত হয় তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রভাষা (আরবী ভাষা) ব্যতিত অন্য ভাষার ব্যবহার অনুমোদিত নয়, কারণ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) অনারবদের নিকট পাঠানো চিঠি অনুবাদ করেননি, যদিওবা ইসলাম উপস্থাপনের জন্য অনুবাদ করার বিষয়টি জরুরী ছিল। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও এর নিজস্ব কাজের সাথে সম্পর্কিত যেকোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আরবী ভাষা ব্যবহারের বিধানের পক্ষে রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) এই কাজটিই দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। এর ভিত্তিতে, রাষ্ট্রের শিক্ষাগত পাঠ্যক্রমে আরবী ব্যতিত অন্য ভাষা ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই, হোক সেটা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বা ইসলামী রাষ্ট্রের বাহিরে বসবাসকৃত অনারব কর্তৃক ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষা। একইভাবে, সরকারি বিদ্যালয়সমূহে আরবী ব্যতিত অন্য কোন ভাষাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা অনুমোদিত নয় এবং বিষয় হিসেবে আরবী ব্যতিত অন্যান্য ভাষা চালু করারও অনুমতি নেই, কারণ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের পাঠ্যক্রম অনুসরনে বাধ্য। সেই মোতাবেক, রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ে, রাষ্ট্রের নিজের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিংবা জনগণের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অথবা এর সাথে সম্পর্কিত যেকোন বিষয়ে বলা ও লেখার কাজে কেবলমাত্র আরবী ভাষা ব্যবহার করতে হবে।

আর যদি বলা ও লেখার বিষয়টি শুধুমাত্র জনগণের নিজেদের সাথে সম্পর্কিত হয় তবে আরবী ব্যতিত অন্য ভাষা ব্যবহার অনুমোদিত, কারণ রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) অন্যান্য ভাষা আরবীতে অনুবাদ করার বা শেখার অনুমতি দিয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, আরবী ব্যতিত অন্য ভাষা বলা ও লেখা অনুমোদিত। আল-বুখারী কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, যায়িদ ইবনে সাবিতের একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়: ***"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে ইহুদীদের কিতাব শেখার নির্দেশ দেন, যাতে করে আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের (সাঃ) চিঠি লিখে দিতে সক্ষম হই এবং যদি তারা তাঁকে (সাঃ) চিঠি লেখে তবে তাঁকে (সাঃ) পড়ে শোনাতে পারি"।*** সুতরাং, এটি আরবী ব্যতিত অন্য ভাষা বলা ও লেখা অনুমোদিত হওয়ার দলিল। সাহাবীদের (রাঃ) সময়েও এমন লোক ছিল যারা বলা ও লেখার জন্য আরবী ব্যতিত অন্য ভাষা ব্যবহার করত এবং তাদেরকে এগুলো শিখতে বাধ্য করা হয়নি, এবং শাসকের জন্য তা অনুবাদের কাজে কাউকে নিয়োগ করা হতো।

আল-বুখারী "শাসকদের ইতিহাস" নামক অধ্যায়ে বর্ণনা করেন যে, যায়িদ ইবনে সাবিত হতে খারিজা বিন যায়িদ বিন সাবিত বলেছেন: ***"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে ইহুদীদের কিতাব শেখার আদেশ দেন। যতক্ষন পর্যন্ত না আমি রাসূলুল্লাহ্‌র চিঠি লিখে দেয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে পারি এবং যদি তারা তাঁকে (সাঃ) চিঠি লেখে তবে তাঁকে (সাঃ) পড়ে শোনাতে পারি"***।

আলী, আবদ আল-রাহমান এবং উসমানের উপস্থিতিতে উমর (রাঃ) বলেছেন, "এই মহিলাটি কি বলছে?" আব্দুল রাহমান ইবনু হাতিব বলেছেন: "সে আপনাকে সেই ব্যক্তির ব্যাপারে অবহিত করছে যে তার সাথে এরূপ ও এরূপ করেছে"।

আবু হামযা বলেছেন: *"আমি ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে অনুবাদ করে দিতাম"*।

যে দুটি দলিল অনুবাদ করার অনুমোদনকে নির্দেশ করে সে দুটি হচ্ছে: যে বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যায়িদ বিন সাবিতকে ইহুদীদের কিতাব শেখার নির্দেশ প্রদান করেন এবং যখন উমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, মহিলাটি কি বলছে- তিনি সেই মহিলাটির কথা বুঝিয়েছিলেন যাকে গর্ভবতী অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল- আবদ্ আল-রহমান তার জন্য মহিলাটির কথা অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। আবু হামযা ইবনে আব্বাসের জন্য অনুবাদ করতেন, এর অর্থ হলো: তখন সেখানে এমন ব্যক্তি ছিল যারা আরবী ব্যতিত অন্য ভাষায় কথা বলত এবং হামযা তাদের বক্তব্যকে অনুবাদ করে দিতেন। অতএব, আরবী ব্যতিত অন্য ভাষায় কথা বলা ও লেখা সুন্নাহ্ দ্বারা এবং সাহাবীদের (রাঃ) কাজ দ্বারা অনুমোদিত; একইভাবে রাষ্ট্র বই, খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিন আরবী ব্যতিত অন্য ভাষায় প্রকাশ করাকে অনুমোদন দেবে এবং এ ধরনের প্রকাশনার ক্ষেত্রে তাদের কোন অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজন হবে না, কারণ এটা মুবাহ্ (অনুমোদিত) কাজের আওতাভুক্ত। এছাড়াও, যদি সেসব চ্যানেল কোন ব্যক্তি বা দলের মালিকানাধীন হয়ে থাকে তবে টেলিভিশনে আরবী ব্যতিত অন্য ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা যাবে। কিন্তু রাষ্ট্রের নিজস্ব টেলিভিশন বা রেডিও চ্যানেলে এটা করা নিষিদ্ধ, কারণ রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত সবকিছুই কেবলমাত্র আরবীতে প্রচারিত হতে হবে। আর জনগনের নিজেদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে সকলক্ষেত্রে আরবী ব্যতিত অন্য ভাষা ব্যবহার করা অনুমোদিত, কিন্তু যদি এরকম কোন সম্ভাবনা থাকে যে মৌলিকভাবে অনুমোদিত কোন সুনির্দিষ্ট বিষয় কোন ক্ষতি বা হারামের দিকে ধাবিত করতে পারে তবে সেক্ষেত্রে বিষয়টিকে অনুমোদন দেয়া হবে না।

ধারা ৯

ইজতিহাদ হচ্ছে ফরযে কিফায়াহ্ এবং ইজতিহাদ করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল যোগ্যতা থাকলে যেকোন মুসলিমের ইজতিহাদ করার অধিকার রয়েছে।

আইনপ্রনেতার বক্তব্য, তথা আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কর্তৃক তাঁর রাসুলের (সাঃ) উপর নাযিলকৃত *শরীয়াহ্র* বাণী হতে *শরীয়াহ্র* হুকুম খুঁজে বের করার জন্য ইসলামী *শরীয়াহ্* মুসলমিদের উপর *ইজতিহাদ* করার বাধ্যবাধকতা অর্পণ করেছে। মূল বিষয় হচ্ছে, অনেকগুলো বর্ণনার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে *ইজতিহাদ* করা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেছেন: ***"যদি একজন শাসককে রায় প্রদানের জন্য ইজতিহাদ করতে হয় এবং যদি সে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে সমর্থ হয় তবে সে দ্বিগুন পুরষ্কার পাবে, আর যদি সে রায় প্রদানের জন্য ইজতিহাদ করার মাধ্যমে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তবে সে একগুন সওয়াব পাবে"*** (আমরু বিন আল-আস হতে উভয়ে সম্মত)। তিনি (সাঃ) আরও বলেছেন: ***"এবং যে ব্যক্তি প্রয়োজনীয় জ্ঞান ব্যতিরেকে মানুষের মধ্যে ফয়সালা করে তবে সে জাহান্নামের আগুনে যাবে"*** (সহীহ সনদ সহকারে সুনান সংকলনকারীগন, আল-হাকিম এবং আল-তাবারনী হতে বর্ণিত)। হাদিসগুলো এটা নিশ্চিত করে যে, বিচারক যে বিষয়ে ফয়সালা দেবে সে বিষয়ে তার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এটাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইবনে মাস্উদকে বলেছেন: ***"কুরআন এবং সুন্নাহ্ অনুসারে রায় প্রদান কর, এবং যদি তুমি এগুলোর মধ্যে হুকুম খুঁজে না পাও তবে ইজতিহাদ কর"*** (আল-আহ্কাম-এ আল-আমিদি কর্তৃক এবং আল-মাহ্সুল-এ আল-রাজি কর্তৃক উল্লেখকৃত)। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মু'আথ এবং আবু মুসা আল-আশ'আরিকে যখন ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি (সাঃ) তাদেরকে বলেছিলেন: ***"তোমরা কি দিয়ে বিচার ফয়সালা করবে?" তারা বলেছিল: "যদি আমরা কুরআনে কিংবা সুন্নাহ্তে হুকুম খুঁজে না পাই তবে আমরা দুটি বিষয়ের মাঝে তুলনার (কিয়াস) মাধ্যমে সাদৃশ্য বের করে যেটা সঠিকের সবচেয়ে নিকটবর্তী সেটা অনুযায়ী কাজ করব"*** (আল-আহ্কামে আল-আমিদি এবং আল-মু'তামাদ-এ আবু আল-হুসেইন কৃর্তৃক উল্লেখকৃত)। হুকুম খুঁজে বের করার জন্য এই *কিয়াস* নিজেই একটি *ইজতিহাদ* এবং রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এটাকে অনুমোদন দিয়েছেন। এটাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মু'আতকে ইয়েমেনের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন তখন তিনি (সাঃ) তাকে বলেছেন: ***"তুমি কি দিয়ে শাসন করবে?" তিনি বলেছিলেন: "আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে"। তিনি (সাঃ) বলেছিলেন: "যদি তুমি সেখানে হুকুম খুজে না পাও তবে?" তিনি বলেছিলেন: "রাসূলুল্লাহ্র (সাঃ) সুন্নাহ্ অনুসারে", তিনি (সাঃ) বলেছিলেন, "যদি তুমি সেখানেও হুকুম খুঁজে না পাও তবে?" তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "আমি আমার নিজের মতামত প্রয়োগ করব"। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন: "সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি তাঁর রাসূলের (সাঃ) দূতকে সেই পথ দেখিয়েছেন যা তাঁর রাসূলকে (সাঃ) সন্তুষ্ট করে"*** (আহ্মদ, আল-তিরমিযী, আল-দারিমি ও আবু দাউদ হতে বর্ণিত এবং আল-হাফিজ ইবনে কাছির আল-বাসরাওয়ি কর্তৃক এর বিশুদ্ধতা প্রমাণিত যিনি বর্ণনাটিকে *হাসান-মাশহুর* বলেছেন এবং ইসলামের পণ্ডিতগন এতে আস্থা জ্ঞাপন করেছেন)।

এটা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, মু'আত-এর *ইজতিহাদের* বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্র (সাঃ) অনুমোদন ছিল। এছাড়াও, হুকুমসমূহের জ্ঞান *ইজতিহাদের* সাথে সম্পর্কিত। কারণ এটা ব্যতিত হুকুমসমূহ সম্পর্কে অনুধাবন ও উপলব্ধি অর্জন সম্ভব নয়। অতএব, *ইজতিহাদ* বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, কারণ *শরীয়াহ্র* মূলনীতিতে আছে যে: ***"ফরযের জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা নিজেই ফরয"***।

বস্তুত, *মুজতাহিদগণ* (যারা *ইজতিহাদ* করার যোগ্যতা রাখেন) হুকুম বের করে থাকেন, কারণ কোন একটি বিষয়ে আল্লাহ্র হুকুমের বিষয়ে জ্ঞান *ইজতিহাদ* ব্যতিরেকে অর্জন সম্ভব নয়, এবং এজন্যই *ইজতিহাদ* অপরিহার্য হয়ে যায়। উসুল আল-ফিকহ্ের (আইন বিজ্ঞানের মূলনীতিসমূহ) পণ্ডিতগন জ্ঞাপন করেছেন যে, মুসলিমদের জন্য *ইজতিহাদ* করা হচ্ছে ফর্যে কিফায়াহ্ এবং কখনও *মুজতাহিদবিহীন* অবস্থায় থাকা মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ এবং যদি তারা সকলে *ইজতিহাদ* পরিত্যাগে সম্মত হয় তবে তারা গুনাহগার হবে, কারন *ইজতিহাদই শরীয়াহ্র* হুকুম জানার একমাত্র উপায়। অতএব, যদি কোন যুগে অন্ততপক্ষে একজন *মুজতাহিদও* না থাকেন যার উপরে হুকুম জানার জন্য ভরসা করা যায়, তবে তা *শরীয়াহ্কে* পক্ষাঘাতগ্রস্থ বা স্থবিরতার দিকে ধাবিত করতে পারে এবং এটা নিষিদ্ধ। সেই সাথে, *শরীয়াহ্র* বিধান *ইজতিহাদ* করাকে মুসলিমদের জন্য অবশ্য পালনীয় করেছে, কারণ এই *শরীয়াহ্র* বিধানসমূহ (কুরআন এবং সুন্নাহ্ ব্যতিত অন্য কিছু নয়) বিস্তারিতভাবে আসেনি, বরং সাধারনভাবে এসেছে, যেগুলোকে মানুষের দেখা প্রতিটি বাস্তবতায় প্রয়োগ করা সম্ভব। প্রত্যেক বিষয়ে *শরীয়াহ্র* হুকুম বের করার জন্য সেই বিষয়টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি এবং সকল প্রচেষ্টা সম্পন্ন করতে হবে। *ইজতিহাদ* কোন অসম্ভব কাজ নয় এবং এটা খুব কঠিনও নয়, বরং সবচেয়ে কম সন্দেহের সাথে

শরীয়াহ্‌র হুকুম বের করার জন্য কোন ব্যক্তির সকল প্রচেষ্টা সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া মাত্র। ভিন্নভাবে বলা যায় যে, এটা হচ্ছে কোন ব্যক্তি কর্তৃক চূড়ান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে *শরীয়াহ্‌র* বিষয়বস্তু অনুধাবন করা, যাতে করে সঠিক উপলব্ধি অর্জন সম্ভব হয় এবং *শরীয়াহ্‌র* হুকুম জানা যায়। বাস্তবতা হচ্ছে, এটা প্রত্যেকের আয়ত্তাধীন একটি বিষয়। প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের কাছে *ইজতিহাদ* ছিল স্বাভাবিক এবং স্পষ্ট একটি বিষয় এবং এর কোন পূর্বশর্ত ছিল না। যেহেতু বিশুদ্ধ আরবী ভাষার জ্ঞান দুর্বল হতে শুরু করেছে এবং মানুষ *দ্বীনকে* গভীরভাবে বোঝার বিষয়ে কম মনোযোগ প্রদান করেছে, সেহেতু বর্ণনাকৃত দলিলসমূহ (*আদিল্লাহ্‌ সাম'ইয়াহ্‌*) সম্পর্কে জানা *মুজতাহিদদের* জন্য অবশ্যপালনীয় হয়ে গেছে, আর এই দলিলসমূহ থেকেই মূলনীতিসমূহ ও হুকুমসমূহ খুঁজে বের করা হয়। এছাড়াও বিশুদ্ধ আরবী ভাষার অভিব্যক্তিসমূহের অর্থ এবং ভাষার অলঙ্কারসমূহের অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধির বিষয়টিও তার জন্য অবশ্যপালনীয় হয়ে গেছে। *ইজতিহাদ* করার জন্য এ দুটো ব্যতিত অন্য কোন শর্ত নেই। অতএব *ইজতিহাদ* সকল মুসলিমের নাগালের মধ্যেই রয়েছে। এসবগুলোই এই ধারাটির স্বপক্ষে দলিল-প্রমান।

ধারা ১০

সকল মুসলিমের ইসলামের দায়িত্ব বহন করা উচিত। ইসলামে যাজক শ্রেণী বলে কোনকিছু নেই এবং মুসলিমদের মধ্যে এ ধরনের মানুষের উপস্থিতির কোন চিহ্ন দেখা দিলে রাষ্ট্র তা প্রতিহত করবে।

যদিওবা সকল *মুজতাহিদই* পণ্ডিত, তথাপি সকল পণ্ডিত *মুজতাহিদ* নন। কারণ একজন পণ্ডিত *মুজতাহিদ* হতে পারেন কিংবা *মুকাল্লিদ্* (অনুসরণকারী) হতে পারেন। যদি মুসলিমগন পালনের উদ্দেশ্যে *শরীয়াহ্* বিধান গ্রহন করে তবে তার জন্য কিছু বিবেচ্য বিষয় রয়েছে: যদি সে কোন *মুজতাহিদের* কাছ থেকে হুকুম গ্রহন করে তবে সেক্ষেত্রে সে *মুজতাহিদকে* অনুসরন করবে। যদি সে *মুজতাহিদ* ভিন্ন অন্য কারও কাছে থেকে হুকুম নিয়ে থাকে তবে সে যে ব্যক্তির নিকট থেকে হুকুমটি নিয়েছে সে ব্যক্তির কাছে থেকে সেটা সম্বন্ধে শিখবে এবং তাকে অনুসরণ করবে না। যাহোক, যদি শেখার জন্য তাকে হুকুমটি নিতে হয় তবে *মুজতাহিদের* কাছ থেকে হুকুমটি নিলেও সে বিষয়ে তার জ্ঞান অর্জন করা উচিত কিংবা *মুজতাহিদ* ব্যতিত অন্য কারও কাছে থেকে নিলেও হুকুমটি সম্পর্কে জানা উচিত। অতএব এই *মুজতাহিদগন* বা অন্যান্য পন্ডিতগন যাজকদের মতো নয়, কারণ তাদের কারোরই কোন কিছু অনুমোদন দেয়ার বা নিষিদ্ধ করার এখতিয়ার নেই এবং প্রতিটি *শরীয়াহ্* বিধানের ক্ষেত্রে তাদের সাথে অন্য মুসলিমদের কোনরূপ পার্থক্য নেই। *শরীয়াহ্* বিধানের ক্ষেত্রে তাদের কারোরই অন্য মুসলিমদের চেয়ে কোন বিষয়ে নিজেকে ব্যতিক্রম মনে করা উচিত নয় এবং এক্ষেত্রে *শরীয়াহ্* বিধান সম্পর্কে জ্ঞান, *ইজতিহাদ* ও এ সম্পর্কিত বিষয়ে তার অবস্থান যত উপরেই হোক না কেন তা বিবেচ্য বিষয় নয়। অতএব যা অন্যদের জন্য *হারাম* তা পন্ডিতদের জন্য অনুমোদিত হবে না এবং অপরের জন্য যা *ওয়াজিব* তা তার জন্য *মানদুব্* (পছন্দনীয়) হয়ে যাবে না। এক্ষেত্রে সে অন্য একজন মুসলিমের মতোই, অতএব খ্রিষ্টানদের মধ্যকার যাজক শ্রেণীর মত কারও অস্তিত্ব ইসলামে নেই। এই যাজক শ্রেণীর অস্তিত্ব খ্রিষ্টানদের মধ্যেই রয়েছে, কারণ একজন যাজক তাদের জন্য অনুমোদিত ও নিষিদ্ধ কাজের বিধান দিয়ে থাকে, তাই মুসলিম পন্ডিতদের এ ধরনের বিশেষনে বিশেষিত করা হলে তা এমন ধারনার জন্ম দিতে পারে যে, খ্রিষ্টানদের চিন্তা-ধারনা মুসলিম পন্ডিতদের উপর আরোপ করা হয়েছে। যদিও বাস্তবতা হচ্ছে যে, মুসলিম পন্ডিতগন কোন কিছুর অনুমোদন দেন না কিংবা কোন কিছু নিষিদ্ধ করেন না। এজন্যই একজন মুসলিম পন্ডিতের উপর যাজক শব্দটির বৈশিষ্ট্য আরোপ করা যথাযথ বা মানানসই হবে না।

খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের অনুসরণকে নিষিদ্ধ করে অনেক সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। আবু সাঈদ আল-খুদরী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: ***"তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেখানো পথে অল্প অল্প করে এবং দ্রুততার সাথে অগ্রসর হবে; তোমরা তাদেরকে অনুসরণ করতে থাকবে, যদিওবা তারা টিকটিকির গর্তে প্রবেশ করে। আমরা বলেছিলাম: হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ), তারা কি ইহুদী ও খ্রিষ্টান? তিনি (সাঃ) বলেছিলেন: আর কারা?"*** (মুসলিমের বর্ণিত শব্দসমূহের সাথে ঐকমত্য রয়েছে)। তাদেরকে অনুসরণ করা যে নিষিদ্ধ সেবিষয়ে এই বর্ণনাটিতে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। অতএব হাদিসটি অনুযায়ী ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের অনুসরণ করা নিষিদ্ধ, কারন এটা মুসলিমদের মধ্যে *কুফর* চিন্তাধারা তৈরীর দিকে নিয়ে যাবে। মুসলিম পন্ডিতদের যাজক হিসেবে বিবেচনা করার মানে হচ্ছে খ্রিষ্টানদেরকে অনুসরন করা, যারা তাদের পন্ডিতদের যাজক হিসেবে বিবেচনা করে থাকে এবং এটা খ্রিষ্টানদের যাজক সংক্রান্ত চিন্তাধারা মুসলিম পন্ডিতদের মধ্যে বহন করতে পারে। অতএব, তাদেরকে অনুসরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং তাদের চিন্তাধারার প্রচলন ঘটানো আরও অধিকতর নিষিদ্ধ কাজের অন্তর্ভূক্ত। অতএব মুসলিম পণ্ডিতদের যাজক হিসেবে উল্লেখ করা ঠিক নয়, এবং পন্ডিতদেরও খ্রিষ্টানদের যাজক-সংক্রান্ত ধারনার মতো করে নিজেদেরকে যাজক মনে করা নিষিদ্ধ। যদি এমন কাউকে পাওয়া যায় যে নিজেকে উপরোক্ত আলোচনার আলোকে নিজেকে যাজক শ্রেণীর মতো মনে করে তবে তাকে নিষেধ করা হবে এবং শাস্তি প্রদান করা হবে, কারণ সে একটি নিষিদ্ধ কাজ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের মধ্য থেকে নিজেকে পোষাক ও চেহারার ভিত্তিতে পার্থক্য করেননি। আল-বুখারী সহীহ্ হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে, আনাস বিন মালিক বলেছেন:, ***"যখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে মসজিদে বসেছিলাম, তখন একজন মানুষ উটে চড়ে মসজিদে প্রবেশ করে। অতঃপর সে উটটি বাঁধল এবং জিজ্ঞেস করল যে: "আপনাদের মধ্যে মুহাম্মদ কে?" আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হেলান দিয়ে বসেছিলেন, সুতরাং আমরা বলেছিলাম: "হেলান দিয়ে বসে থাকা এই ফর্সা ব্যক্তি" এবং তখন সে বলেছিল: "হে ইবনে আবদ-আল-মুত্তালিব" অতঃপর, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে বলেছিলেন: "আমি তোমাকে উত্তর দিয়েছি..."***, উপরে উল্লেখিত কারনে এই ধারাটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ধারা ১১

রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামের *দাওয়াহ্* (ইসলামের প্রতি আহ্বান) বহন করা।

এই ধারাটি অন্তর্ভূক্ত করার কারণ হচ্ছে, মুসলিমদের উপর যেরূপভাবে ইসলামের *দাওয়াহ্* বহনের দায়িত্ব রয়েছে সেরূপভাবে রাষ্ট্রের উপরও এই দায়িত্ব বিদ্যমান। যদিও ইসলামের প্রতি *দাওয়াহ্র* বিষয়টি *শরীয়াহ্* বাস্তবায়নের অংশ এবং এটা *শরীয়াহ্* বিধান যে, ব্যক্তিগতভাবে মুসলিমরা যেভাবে এই দায়িত্ব পালন করে সেভাবে রাষ্ট্রেরও অবশ্যই তা পালন করতে হবে, তবুও অন্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক তৈরীর ক্ষেত্রে এই বিধানটি ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ভিন্নভাবে বলা যায়, এটাই হচ্ছে সেই ভিত্তি যার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের সামগ্রিক পররাষ্ট্র নীতি তৈরী হয়। অতএব ইসলামী *দাওয়াহ্* বহনই হচ্ছে রাষ্ট্রের মূল কাজ।

ইসলামের প্রতি *দাওয়াহ্* বহন করা যে ফরয দায়িত্ব তা আল্লাহ্র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বানীতে আসা শব্দ হতে বোঝা যায়: ***"এবং আমার কাছে এ কুরআন প্রেরিত হয়েছ যেন আমি এর মাধ্যমে তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে ইহা পৌঁছুবে তাদের সবাইকে সতর্ক করি"*** (আনআম-১৯); এর অর্থ হচ্ছে, এই কুরআন যার কাছেই পৌঁছুবে তাকে সতর্ক করা। অতএব, এই সতর্কবার্তা তোমাদের মানে মুসলিমদের জন্য এবং এটাকে তোমরা যাদের কাছে নিয়ে যাবে তাদের জন্যও সতর্কবাণী; অতএব, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে মুসলিমদের প্রতি আহ্বান যে তারা এটাকে বহন করে নিয়ে যাবে। ভিন্নভাবে বলা যায় যে, এটা শুধুমাত্র তোমাদের জন্য সতর্কবার্তা নয় বরং এটা তোমাদের প্রতি ও কুরআন যাদের কাছে পৌঁছুবে তাদের সকলের প্রতি সতর্কবার্তা, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ***"আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে আলোকিত করুন যে আমার বক্তব্য শুনে অনুধাবন করে, স্মরন রাখে এবং এর প্রতি আহ্বান করে; সে হয়ত এমন কারও কাছে ফিকহ্ (জ্ঞান) নিয়ে যাচ্ছে যে তার চেয়ে অধিকতর ফকীহ্ (জ্ঞানী)"*** (আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ হতে মুসনাদ আল-শাফি-তে বর্ণিত)। এছাড়াও আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"আর তোমাদের মঝে এমন এক দল থাকা আবশ্যক যারা মানুষকে কল্যানের দিকে আহ্বান করবে"*** (আলে ইমরান: ১০৪), এবং এই কল্যাণ হচ্ছে ইসলাম, আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন: ***"আর তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম, যে মানুষকে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান করে"*** (হা-মীম আস্ সাজদা: ৩৩), ভিন্নভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ্র *দ্বীনের* প্রতি আহ্বান। এ সকল আয়াত ও হাদীসসমূহ এটাই নির্দেশ করে যে, ইসলামের প্রতি আহ্বানের *দাওয়াহ্* বহন বাধ্যতামূলক এবং এই দায়বদ্ধতা সাধারনভাবে এসেছে, যার মধ্যে মুসলিমদের সাথে রাষ্ট্রও সামগ্রিকভাবে অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হচ্ছে *দাওয়াহ্* বহন করা, এর স্বপক্ষে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথা এবং কাজ থেকে দলিল-প্রমান উদ্ভুত হয়েছে। তিনি বলেছেন: ***"যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষেরা দৃঢ়ভাবে ঘোষনা করছে যে আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন মাবুদ নেই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। যদি তারা এটা বলে তবে তাদের জীবন ও সম্পদ আমার নিকট অলঙ্ঘনীয় থাকবে, তবে সেটা ব্যতিত যেটা অধিকার এবং আল্লাহ্র সাথে তাদের হিসাবের অন্তর্ভূক্ত"*** (মুসলিমের ব্যবহৃত শব্দসমূহের সাথে ঐক্যমত্য রয়েছে)। আল-বুখারীতে উরওয়াহ্ বিন আল-যা'দ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: ***"যে ঘোড়া চুর্নকুন্তলের সাথে বাধা অবস্থায় রয়েছে সেটা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত উত্তম"***, এবং এই ঘোড়ার মাধ্যমে *জিহাদ* অব্যাহত রাখার দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এছাড়াও, নেতা ন্যায়নিষ্ঠ নাকি অসৎ সেটার উপরে *জিহাদ* নির্ভর করবে না, কারণ এই হাদিস থেকে এই নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নেতা মুসলিম থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ন্যায়নিষ্ঠ হোক কিংবা অসৎ হোক তা বিবেচনা না করে *জিহাদ* অব্যাহত রাখতে হবে। যখন আল-বুখারী "ন্যায়নিষ্ঠ বা অসৎ নেতার সাথে *জিহাদ* অব্যাহত রাখার অধ্যায়" নামক আলাদা একটি বিভাগ সন্নিবেশিত করেন তখন তিনি এই বর্ণনাটিকে *জিহাদ* অব্যাহত রাখার দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন, কারন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এতে বলেছেন: ***"যে ঘোড়া চুর্ণকুন্তলের সাথে বাধা অবস্থায় রয়েছে সেটা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত উত্তম"***। আহমদ্ও এই হাদিসটিকে আল-বুখারীর মতো দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। একইভাবে, আনাস হতে সাইদ বিন মানসুর উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: ***"এবং জিহাদ অব্যাহত থাকবে, যেহেতু আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন এবং এটা ততক্ষন পর্যন্ত বজায় থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার উম্মাহ্র সর্বশেষ প্রজন্ম দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করে; এটা কোন জালেমের জুলুম দ্বারা কিংবা কোন বিচারের রায়ের দ্বারা বন্ধ হবে না"*** (আবু দাউদ কর্তৃকও এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছিল এবং আল-তিরমিযী এর উপরে কোন মন্তব্য করেননি)। সুতরাং, এ লড়াইয়ের বাধ্যবাধকতা ততক্ষন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত না এর প্রতিহতকারীরা একথা বলবে যে, আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র রাসূল, এটা রাষ্ট্রের উপর ইসলামী *দাওয়াহ্* বহনের দায়বদ্ধতার বিষয়ে দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। আর এই *দাওয়াহ্* বহন মানে *জিহাদ* ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে যতক্ষণ

পর্যন্ত না *উম্মাহ্‌র* সর্বশেষ প্রজন্ম *দাজ্জালের* সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, রাষ্ট্রের জন্য অব্যাহত কাজই হচ্ছে *জিহাদ* এবং এটি থেকে বিচ্যুত হওয়া অনুমোদিত নয় এর স্বপক্ষে *শরীয়াহ্‌র* দলিল। অতএব এটিই রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব কারন সেই দায়িত্বই প্রধান দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হয় যেটা সকল পরিস্থিতিতে এবং কোনরকম বিরতি না দিয়ে অব্যাহতভাবে পালন করতে হয়।

এছাড়াও, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মদিনাতে স্থায়ী হওয়ার পর থেকে এই পৃথিবী ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত *জিহাদরত* অবস্থায় ছিলেন এবং *জিহাদই* ছিল প্রধান কর্তব্য। *খুলাফায়ে* রাশিদাহ্‌গণ তাঁর (সাঃ) পরে দায়িত্ব গ্রহন করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) পথ অনুসরন করে *জিহাদকে* তাদের প্রধান কর্তব্য হিসেবে গ্রহন করেছেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যে রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেটার প্রধান দায়িত্ব ছিল *জিহাদ* করা; যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান তখন সাহাবীদের (রাঃ) মধ্য থেকে *খলীফাগণ* রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং একইভাবে রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব ছিল *জিহাদ* অব্যাহত রাখা। অতএব *সুন্নাহ্‌* ও সাহাবীদের *ইজমা* থেকে উদ্ভুত দলিল থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের *দাওয়াহ্‌* বহন করাই রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব।

এছাড়াও, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এই পৃথিবী ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের প্রতি আহ্বান করে গেছেন, কারণ আল্লাহ্‌ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাঁকে (সাঃ) নবী হিসেবে প্রেরন করেছেন। তিনি (সাঃ) ছিলেন মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান এবং যখন থেকে তিনি (সাঃ) সেখানে স্থায়ী হয়েছেন তখন থেকে তিনি (সাঃ) পররাষ্ট্র নীতিকে প্রধান দায়িত্ব হিসেবে গ্রহন করেছেন এবং সেটাই ছিল রাষ্ট্রের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। এর অধীনে যে সকল পদক্ষেপ নেয়া হতো সেগুলো হচ্ছে: অতর্কিত হামলা, অভিযান পরিচালনা, গোয়েন্দা কার্যক্রম এবং চুক্তি সাক্ষর। এসব কাজের উদ্দেশ্য ছিল সকল মানুষের কাছে ইসলামের *দাওয়াহ্‌* বহন করা। যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) রাষ্ট্রের শক্তি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে *দাওয়াহ্‌* বহনের সক্ষমতার বিষয়টি অনুভব করেন, তখন তিনি (সাঃ) একইসাথে বারজন সম্রাটের কাছে ইসলাম গ্রহনের আমন্ত্রন জানিয়ে বারজন দূত প্রেরণ করেন, যাদের মধ্যে পারস্য ও রোমের সম্রাটও ছিল। আনাস্‌ বিন মালিক হতে মুসলিম উল্লেখ করেছেন যে: ***"আল্লাহ্‌র নবী কিস্‌রা, সিজার এবং আল-নাজ্জাশীকে এবং অন্যান্য সকল ক্ষমতাসীনদের আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন"***। যখন তিনি (সাঃ) আরব উপদ্বীপে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সম্পর্কে এবং আরবদের মধ্যে *দাওয়াহ্‌* প্রসারের ব্যাপকতা সম্পর্কে সন্তুষ্টি অনুভব করেন এবং যখন মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে দলে দলে আল্লাহ্‌র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) *দ্বীন* গ্রহন করতে শুরু করে তখন তিনি (সাঃ) রোমানদের পরাভূত করার দিকে নজর দেন; এজন্যই মু'তা ও তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এটাও এবিষয়ের দলিল হিসেবে বিবেচিত হয় যে, *দাওয়াহ্‌* বহন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং এটাই রাষ্ট্রের প্রধান কাজ।

ধারা ১২

শারী'য়াহ্ আইনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র *কুর'আন, সুন্নাহ্,* সাহাবাদের *ইজ্‌মা* এবং *ক্বিয়াসকেই* (তুলনীয় সাদৃশ্য) দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এবং এই দলিলসমূহ ব্যতিত অন্যান্য উৎস হতে কোন আইন গ্রহন করা বৈধ নয়।

এই ধারাটি পরোক্ষভাবে এটা প্রকাশ করে না যে, রাষ্ট্র *ইজ্‌তিহাদের* একটি পদ্ধতি গ্রহণ করবে; বরং এর অর্থ হচ্ছে যে, রাষ্ট্র *শারী'য়াহ্* হুকুমসমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করবে। এর কারণ হচ্ছে, কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জন্য *শারী'য়াহ্* হুকুম গ্রহণ বাধ্যতামূলক হতে পারে, আবার অন্য ক্ষেত্রে অনুমোদিত হতে পারে। যদি এই হুকুম গ্রহণের বিষয়টি দুটি পরস্পরবিরোধী পদ্ধতিতে সমাধা করা হয় তবে হুকুম গ্রহণের ভিত্তির মধ্যে অসঙ্গতি সৃষ্টি হতে পারে। অতএব, *শারী'য়াহ্* হুকুম গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। যে তিনটি কারণ হুকুম গ্রহণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণের তাগিদ দেয় সেগুলো হচ্ছে:

প্রথমত, যে হুকুম অনুযায়ী মুসলিমদের অগ্রসর হওয়া উচিত সেটি হচ্ছে *শারী'য়াহ্* হতে আসা হুকুম, যৌক্তিক প্রক্রিয়া হতে আসা হুকুম নয়; ভিন্নভাবে বলা যায় যে বিষয়টির ক্ষেত্রে আল্লাহ্ প্রদত্ত হুকুম অনুসরণ করতে হবে, মানুষ কর্তৃক প্রবর্তিত আইন নয়। অতএব, যে দলিল হতে হুকুম খুজে বের করা হয় সেটি অবশ্যই ওহী হিসেবে আসা দলিল হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যে দলিলের উপর ভিত্তি করে *শারী'য়াহ্* হুকুম উদ্ভুত হবে সেটা যে ওহী হিসেবে নাযিলকৃত, তা অবশ্যই চুড়ান্তভাবে প্রমাণিত হতে হবে। ভিন্ন শব্দে, যে দলিলের উপর ভিত্তি করে *শারী'য়াহ্* হুকুম উদ্ভুত হয় সেটা যে ওহী হিসেবে প্রাপ্ত, তা অনির্দিষ্ট নয় বরং চূড়ান্ত এবং নিষ্পত্তিমূলক হওয়া অপরিহার্য। এর কারণ হচ্ছে যে, এটা "*উসূলের*" (মূলনীতিসমূহের) অংশ, আনুসঙ্গিক বিধিবিধানের অংশ নয়। অতএব, যেহেতু এটা *আক্বীদাহ্*'গত বিষয়সমূহের অংশ এবং *শারী'য়াহ্* বিধানের অংশ নয়, সেহেতু দলিল সম্ভাব্য বা আনুমানিক হওয়া যথেষ্ট নয়। এটা এরকম হওয়ার কারণ হচ্ছে, হুকুম খুঁজে বের করার জন্য ওহী হিসেবে নাযিলকৃত দলিলের প্রয়োজন, কেবলমাত্র যেকোন ধরনের দলিল যথেষ্ট নয়। অতএব, এটা চূড়ান্তভাবে প্রমানিত হওয়া অপরিহার্য যে দলিলটি ওহীর মাধ্যমে এসেছে এবং বিষয়টি যে ওহীর মাধ্যমে আসা, তা *আক্বীদাহ্* বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং *শারী'য়াহ্* বিধি-বিধানের অংশ নয়। অতএব, সুনির্দিষ্ট ও চুড়ান্তভাবে প্রমাণিত দলিলের মাধ্যমে এটা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য যে দলিলটি ওহীর মাধ্যমে এসেছে, কারণ *আক্বীদাহ্*'র বিষয়সমূহ কেবলমাত্র চুড়ান্তভাবেই নেয়া যায়।

তৃতীয়ত, এটা চূড়ান্ত যে মানুষ তার জীবনে কিরূপ আচার-ব্যবহার করবে সেটা নির্ভর করে জীবন সম্পর্কে তার সামগ্রিক ধারণার উপর। যদিও, জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির মূলে *আক্বীদাহ্* ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, তথাপি এটা কিছু ধারণার সমষ্টি, মাপকাঠি ও বিশ্বাসের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। এ সকল ধারণা, মাপকাঠি ও বিশ্বাস হতে প্রতিফলিত সকল চিন্তাসমূহ *আক্বীদাহ্*'গত বিষয়ের অংশ নয়, বরং সেগুলোর মধ্য হতে কিছু *আক্বীদাহ্*'র বিষয় এবং অন্যগুলো *শারী'য়াহ্*'র বিধিবিধানের বিষয় এবং যেহেতু আইনসমূহ সর্বনিম্ন সন্দেহের সাথে খুঁজে বের করা হয় সেহেতু এই শংকা রয়েছে যে, যদি আইনের উৎস ওহীর মতো করে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত না হয় তবে প্রাথমিকভাবে নাযিলকৃত ওহী কর্তৃক সমর্থিত মূলনীতিসমূহের উপর ভিত্তি না করে উদ্ভুত *শারী'য়াহ্* বিধানের উপস্থিতির কারনে উম্মাহ্'র মধ্যে ইসলাম বহির্ভুত চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। যদি এটা ছড়িয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে তবে তা *উম্মাহ্*'র জীবন সম্পর্কিত ধারণাকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এর পরিণামে *উম্মাহ্*'র আচার-আচরণও প্রভাবিত হবে। এইজন্য, যেসব দলিলের উপর ভিত্তি করে উদ্ভুত আইনসমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে, সেগুলো যে অবশ্যই ওহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত তা প্রমাণিত হওয়া অপরিহার্য।

এই তিনটি কারনে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করা অপরিহার্য, আর এর ভিত্তিতেই *শারী'য়াহ্*'র বিধিবিধান গৃহীত হয়ে থাকে। দলিলসমূহ যে কেবলমাত্র উপরে উল্লেখিত চারটি উৎসের মধ্যে সীমাবদ্ধ সে বিষয়ের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এটা অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রমাণিত। যেসব দলিলসমূহ

ওহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে সেসব দলিলসমূহ আমরা সুক্ষভাবে বিশ্লেষন করেছি ও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছি এবং আমরা এই চারটি ব্যতিত অন্যকোন উৎস খুঁজে পাইনি।

কুর'আনের ক্ষেত্রে: এ বিষয়ে দলিল হচ্ছে যে এটা ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে এবং এর শব্দসমূহ চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত। *কুর'আনের* অলৌকিকত্ব চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে, এটা সুনিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্'র (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বাণী এবং মানুষের বক্তব্য নয়। অতএব, চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত দলিল দ্বারা এটা প্রতিষ্ঠিত যে *কুর'আন* আল্লাহ্'র (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বাণী। অলৌকিকত্বের প্রমাণের মাধ্যমে আল্লাহ্'র বাণী হিসেবে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত কুর'আন নিজেই বলে যে, এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর নাযিলকৃত ওহী; আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিবরাঈল এটাকে নিয়ে এসেছেন- আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন"* (শূরা: ১৯৩-১৯৪);

"এবং আমার কাছে এ কুর'আন প্রেরিত হয়েছে" (আন'আম: ১৯);

"বলুন: আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করছি" (আম্বিয়া: ৪৫);

"আমি এ কুর'আন আপনার প্রতি এজন্য নাযিল করিনি যে আপনি কষ্ট ভোগ করবেন" (ত্বাহা: ২);

"আর আপনাকে তো কুর'আন প্রদান করা হচ্ছে মহাপ্রজ্ঞাময় অসীম জ্ঞানী আল্লাহ্'র কাছ থেকে" (নামল: ৬);

"আমি তো আপনার প্রতি কুর'আন নাযিল করেছি অল্প অল্প করে পর্যায়ক্রমে" (দাহর: ২৩)

এবং *"এরূপে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কুর'আনকে ওহীরূপে নাযিল করেছি"* (শূরা: ৭)।

এই আয়াতসমূহ হচ্ছে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত দলিল যা এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে যে *কুর'আন* আল্লাহ্'র (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) ওহীর মাধ্যমে এসেছে।

সুন্নাহ্'র ক্ষেত্রে: এটাও যে আল্লাহ্'র (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) প্রেরিত ওহী যা অর্থের দিক দিয়ে তাঁর (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) কাছ থেকে এসেছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের ভাষায় এটা প্রকাশ করেছেন, সে বিষয়ে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত দলিল *কুর'আনের* আয়াতের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে। আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"আর তিনি মনগড়া কথাও বলেন না, এটা ওহী ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়"* (নাজম: ৩-৪);

"নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সেরূপ ওহী প্রেরণ করেছি যেরূপ নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম" (নিসা: ১৬৩);

"আমি তো শুধু সে ওহীর অনুসরণ করি যা আমার প্রতি নাযিল হয়" (আন'আম: ৫০);

"বলুন: আমি তো শুধু তারণ অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি আমার রবের তরফ থেকে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে" (আ'রাফ: ২০৩);

"বলুন: আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করছি" (আম্বিয়া: ৪৫)

এবং আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক"* (হাশর: ৭)।

এই আয়াতগুলোই সুস্পষ্ট প্রমান যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) *সুন্নাহ্* হিসেবে যা বলেছেন তা ওহী হিসেবেই এসেছে; এগুলো সুস্পষ্ট দলিল হিসেবে এটাও নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) *কুর'আনে* স্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা আমাদেরকে মানার আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি (সা.) যেটা করতে নিষেধ করেছেন সেটা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ নির্দেশটি সাধারণভাবেই এসেছে; অতএব, *সুন্নাহ্*'র ওহী হিসেবে আসার দলিল চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত, কারণ এটা *কুর'আনের* আয়াতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর অন্তর্নিহিত নির্দেশনা সুনির্দিষ্ট।

শারী'য়াহ্ দলিল হিসেবে স্বীকৃত সাহাবাদের *ইজ্‌মা'র* ক্ষেত্রে: এর অর্থ হচ্ছে যে যেসব হুকুমের উপর সাহাবাদের সাধারণ ঐক্যমত্য রয়েছে সেগুলো *শারী'য়াহ্* আইন হিসেবে বিবেচিত হবে, অথবা এরূপ ও এরূপ সংক্রান্ত বিষয়ে হুকুম হচ্ছে এরূপ ও এরূপ- এবিষয়ে সাহাবাদের সাধারণ ঐক্যমত্য আছে। অতএব, কোন একটি হুকুমকে যদি তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে *শারী'য়াহ্* হুকুম হিসেবে বিবেচনা করেন, তবে তাদের এই *ইজ্‌মা* (সাধারণ ঐক্যমত্য) *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

দুটি বিষয়ের মধ্যে এর স্বপক্ষে দলিল পাওয়া যায়, প্রথমত: আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) তাদের সম্বন্ধে *কুর'আনের* আয়াতের মধ্যে প্রশংসা করেছেন, যা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত এবং অর্থের দিক দিয়েও সুনির্দিষ্ট। আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন: *"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ সুব্‌হানাহু ওয়া তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এমন জান্নাত যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। এটা মহাসাফল্য"* (তাওবা: ১০০)।

এই *মুহাযির'*দেরকে (হিজরতকারী), *আনসার'*দেরকে (সাহায্যকারী) এবং তাঁদেরকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণকারীদেরকে তাদের হিজরত ও সাহায্যের কারনে আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) যে প্রশংসা করেছেন, সেটা হচ্ছে সম্মিলিতভাবে সাহাবাদের জন্য প্রশংসা। কারণ, এই প্রশংসিত ব্যক্তিবর্গই হচ্ছেন সাহাবা এবং এই আয়াতের অর্থ তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই প্রশংসা সম্মিলিতভাবে তাদের সকলের জন্য এবং আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) যেভাবে তাদের সত্যবাদীতার প্রশংসা করেছেন তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে: আমরা আমাদের *দ্বীন* এই সাহাবাদের নিকট থেকে নিয়েছি, কারণ আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর নাযিলকৃত *কুর'আন* তাঁরাই আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব যদি আমরা মনে করি যে কোন একটি ত্রুটিযুক্ত বিষয়ে তাদের সকলের সম্মতি রয়েছে, তবে এর অর্থ হচ্ছে এই ত্রুটি *কুর'আনের* ক্ষেত্রেও হতে পারে; ভিন্ন শব্দে বলা যায় তাদের কাছ থেকে নেয়া *দ্বীনের* মধ্যে ত্রুটির অনুপ্রবেশ হতে পারে যা *শারী'য়াহ্* দৃষ্টিকোন থেকে অসম্ভব। অতএব, যদিও যৌক্তিকভাবে কোন একটি ভ্রান্ত বিষয়ে সাহাবাদের সকলের ঐক্যমতে পৌছানো অসম্ভব নয় - কারণ তারা সবাই মানুষ - তথাপি *শারী'য়াহ্* দৃষ্টিকোন থেকে এটা ঘটা সম্ভব নয়। কারণ, যদি এটা ঘটা সম্ভব হয় তবে এটাও ঘটা সম্ভব যে, *দ্বীনের* মধ্যে ভুলভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভিন্নভাবে বলা যায়, এটা হওয়াও সম্ভব হতে পারে যে, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর যে *কুর'আন* নাযিল হয়েছে সেই একই *কুর'আন* আমাদের কাছে বিদ্যমান রয়েছে - এ সত্যের মধ্যেও ভুলের অবকাশ রয়েছে, যা *শারী'য়াহ্* দৃষ্টিকোন থেকে অসম্ভব। অতএব, এটাও অসম্ভব যে তারা সকলেই সাধারণভাবে কোন ভুলের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন।

এটা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত করে যে, সাহাবাদের *ইজ্‌মা* হচ্ছে *শারী'য়াহ্*'র দলিল। এছাড়াও আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন: *"আমিই স্বয়ং এ কুর'আন নাযিল করেছি এবং আমিই স্বয়ং এর হেফাজতকারী"* (হিজর: ৯)। অতএব, আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) *কুর'আন*কে হেফাজত করার ওয়াদা করেছেন এবং যিনি এই কুর'আন হেফাজত করেছেন তিনিই এ *কুর'আন* পৌঁছে দিয়েছেন; অতএব, এটা কুর'আন বহন এবং সংকলনের ক্ষেত্রে তাদের সত্যবাদিতার প্রমান। সেইসাথে এটা তাদের সাধারণ ঐক্যমত্যের নির্ভরযোগ্যতার স্বপক্ষে প্রমানও বটে; কারণ, যদি তাদের ঐক্যমত্যে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা থাকে তবে এটাও হতে পারে যে, *কুর'আন* সংকলন ও বহনেও ত্রুটি রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে *কুর'আন* অরক্ষিত অবস্থায় থাকার সম্ভাবনাও বিদ্যমান। অতএব, যেহেতু *কুর'আন* অরক্ষিত অবস্থায় থাকা সম্ভব নয় সেহেতু এটা বহন, সংকলন ও সংরক্ষনেও কোন ত্রুটি থাকা সম্ভব নয়, কারণ *কুর'আনের* আয়াতের মধ্যে এ সম্বন্ধে নির্দেশনা রয়েছে। অতএব সাহাবাদের *ইজ্‌মা* চূড়ান্তভাবে প্রমানিত দলিল।

যাহোক, যে বিষয়টি পুরোপুরি পরিষ্কার থাকা দরকার সেটা হচ্ছে: যদি সাহাবাগণ ঐক্যমত্যে পৌঁছে থাকেন যে, অমুক এবং অমুক হুকুম হচ্ছে *শারী'য়াহ্*'র বিধান তবে এর অর্থ হচ্ছে একটি দলিল পেশ করা; ভিন্ন শব্দে, ঐ হুকুমগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাজ, কথা বা নীরব সম্মতির দলিল হতে উদ্ভুত হয়েছে এবং সাহাবাগণ হুকুমগুলো জানিয়েছেন, কিন্তু দলিলসমূহ উপস্থাপন করেননি। তবে, হুকুমটি যেহেতু তাঁরা বহন করেছেন সেহেতু

এটাই প্রমানিত হয় যে এর পক্ষে দলিলও বিদ্যমান। অতএব তাদের সাধারণ ঐক্যমত্যের অর্থ এটা নয় যে, কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের ব্যক্তিগত মতামতের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে, আর তাদের ব্যক্তিগত মতামত ওহী নয় এবং প্রতিটি ব্যক্তিগত মতামত অব্যর্থ বা ত্রুটিহীন নয়। অতএব, কোন একজন সাহাবীর ব্যক্তিগত মতামত *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য *শারী'য়াহ্*'র দলিল ওহীর মতো করে আসতে হবে এবং সাহাবাদের ব্যক্তিগত মতামত এ শর্ত পূরণ করে না; তাই তারা *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। এক্ষেত্রে কোন মতামতের ক্ষেত্রে তাদের ঐক্যমত্য আছে কি নেই এটা বিবেচ্য বিষয় নয়। এই কারনে সাহাবাদের *ইজ্‌মা* মানে এটা নয় যে, কোন একটি মতের ক্ষেত্রে তাদের ঐক্যমত্য রয়েছে; বরং এর অর্থ হচ্ছে, কোন একটি হুকুম কিংবা, অমুক ও অমুক হুকুম যে *শারী'য়াহ্*'র বিধান এ বিষয়ে তাদের ঐক্যমত্য রয়েছে। এক্ষেত্রে এই হুকুম তাদের ব্যক্তিগত মতামত নয়, বরং এটা যে *শারী'য়াহ্* সে বিষয়ে তাদের সাধারণ ঐক্যমত্য; তাই, সাহাবাদের *ইজ্‌মা* হচ্ছে কোন একটি দলিলের উন্মোচন।

ক্বিয়াসে'র ক্ষেত্রে: এটাও *শারী'য়াহ্*'র দলিল। ভাষাগত দিক দিয়ে এর অর্থ হচ্ছে আনুমানিক বিশ্লেষণ এবং উসূলের দিক দিয়ে এর অর্থ হচ্ছে, অন্য একটি পরিচিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কোন একটি পরিচিত বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে বের করা, যাতে করে তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ উপাদানের উপস্থিতির কারনে তাদের উভয়ের জন্য কোন একটি হুকুমকে চূড়ান্ত করা যায়, কিংবা পরিত্যাগ করা যায়। অতএব, হুকুমের *ইল্লাহ্*র (কারণ) ক্ষেত্রে পরিচিত বিষয়দ্বয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কারনে একটি পরিচিত বিষয়ের হুকুমের সাথে অন্য একটি পরিচিত বিষয়ের তুলনা করাই হচ্ছে *ক্বিয়াস*। তদানুসারে, এটা হচ্ছে শাখার দিকে মূলের পরিব্যাপ্তি, অথবা ভিন্ন শব্দে বলা যায় যে মূলের সাথে শাখার সংযোগ। একটি পরিচিত বিষয়ের বাস্তবতা অনুযায়ী অন্য একটি পরিচিত বিষয়ের হুকুম নির্ধারণের অর্থ হচ্ছে একটি বিষয়ের হুকুম অন্য বিষয়ের সাথে ভাগ করে নেয়া, ফলে মূলের হুকুমটি শাখার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শাখাটিও মূলের মতো একই হুকুম গ্রহন করে। মূলের এই হুকুমটি সুনিশ্চিত হতে পারে, ইবনে আব্বাস হতে আল বুখারী বর্ণনা করেছেন: *"যুহাইনামা থেকে একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এসেছিল এবং বলেছিল: আমার মা হজ্জ করার ওয়াদা করেছিলেন কিন্তু তিনি তার মৃত্যুর পূর্বে তা পূরণ করতে পারেননি, তাই তার পক্ষ হতে আমার কি হজ্জে যাওয়া উচিত? তিনি (সা.) বলেছিলেন: হ্যা, তার পক্ষ হতে হজ্জ করে নাও- তুমি তো জানো যে, যদি তোমার মার কোন ঋণ থাকে তবে তোমার তা পরিশোধ করে দেয়া উচিত, সুতরাং আল্লাহ্'র কাছে যে ঋণ রয়েছে তা পরিশোধ কর, কারণ ঋণ পরিশোধের জন্য আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) অধিকতর যোগ্য"*। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মানুষের ঋণের সাথে আল্লাহ্'র (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) ঋণের তুলনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটা পরিশোধ করা যথাযোগ্য। এই উদাহরণটি এই হুকুমকে নিশ্চিত করে যে, ঋণের নিষ্পত্তি পর্যাপ্তভাবে হতে হবে।

মূলের যে হুকুমটির সাথে তুলনা করা হয় সেটি সুনিশ্চিতভাবে স্বীকৃত নাও হতে পারে, কারণ উমর (রা.) হতে বর্ণিত একটি বর্ণনায় আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা.) রোযাদারের চুম্বন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে চুম্বনের ফলে রোযা ভেঙ্গে যায় কি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন: *"তুমি যদি পানি দিয়ে তোমার মুখ ধৌত কর (রোযা অবস্থায়) তবে সেটা কি তোমার রোযা ভেঙ্গে দেয়? তিনি উত্তরে বলেছিলেন "না"* (আল-হাকিম কর্তৃক স্বীকৃত ও আল দাহাবি কর্তৃক অনুমোদিত), এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রোযাদার ব্যক্তির চুম্বনের সাথে পানি দিয়ে কুলি করাকে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা রোযা নষ্ট করে দেয় না। অতএব এই বিষয়ে হুকুমটি হচ্ছে 'না'বোধক, অর্থাৎ এক্ষেত্রে রোযা না ভাঙ্গার বিষয়টি নির্দেশ করা হয়েছে।

দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি সাদৃশ্যপূর্ণ উপাদানের উপর ভিত্তি করে এই তুলনামূলক সাদৃশ্য খুঁজে বের করার অর্থ হচ্ছে - মূল বিষয়ের *ইল্লাহ্* (*শারী'য়াহ্* কারণ) শাখার মধ্যেও পাওয়া যায়। এটা এই *ইল্লাহ্*র ভিত্তিতেই করা হয় যা অন্যটির উপর আরোপিত হয় এবং তুলনীয় বিষয়দ্বয়ের মধ্যে বা ভিন্ন শব্দে, মূল ও শাখার মধ্যে এই *ইল্লাহ্*টি হচ্ছে সাদৃশ্যপূর্ণ উপাদান। রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) কাছে যখন পাকা খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ক্রয়ের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় তখন এর একটি উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি (সা.) বলেছিলেন: *"রুতাব শুকিয়ে গেলে কি ওজনে হালকা হয়ে যায়?" তারা বলেছিল: "জ্বী" সুতরাং তিনি (সা.) বলেছিলেন "এক্ষেত্রে এটা করা যাবে না"* (সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস হতে এই শব্দসমূহ সহকারে আবু ই'য়ালা কর্তৃক বর্ণিত এবং আল হাকিম ও ইবনে হিব্বান কর্তৃক অনুমোদিত)। এখানে আল্লাহ্'র রাসূল (সা.) সুদের অর্থের মধ্যে যে *ইল্লাহ্* আছে

সেটার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন; এখানে *ইল্লাহ্*টি হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া; এবং এটি খেজুরের বিনিময়ে রুতাব বিক্রয়ের মধ্যেও পাওয়া গিয়েছিল এবং যখন তিনি (সা.) এটার উপস্থিতির বিষয়ে অবগত হলেন তখন তিনি এ ধরনের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে *রিবা'র* হুকুম প্রযোজ্য হবে বলে নিশ্চিত করেছেন। অতএব তিনি বলেছিলেন যে: *"এক্ষেত্রেও তা নিষিদ্ধ"*। ভিন্ন শব্দে, এ ধরনের পণ্য বিনিময় করা নিষিদ্ধ কারণ এটা শুকিয়ে গেলে ওজনে হ্রাস পায়: অতএব আল্লাহ্'র রাসূল (সা.) সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়টির দিকে নির্দেশ করেন যা *রিবা'র শারী'য়াহ্ ইল্লাহ্* হিসেবে বিবেচিত।
শারী'য়াহ্ অনুসারে এটাই হচ্ছে *ক্বিয়াসে'র* সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞাটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বর্ণনা হতে উদ্ভুত হয়েছে। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে: *"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট একজন মহিলা আসল এবং বলল: "হে আল্লাহ্'র রাসূল (সা.), আমার মা আল্লাহ্'র কাছে একটি রোযা রাখার ওয়াদা করেছিলেন, কিন্তু সেই রোযা পূর্ণ করার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারব? তিনি (সা.) বল্লেন: "যদি তোমার মায়ের কোন ঋণ থাকে এবং তুমি তা পরিশোধ করে দাও তবে কি সেটা তোমার মায়ের জন্য যথেষ্ট হবে?" মহিলাটি বলল: "জ্বী" তিনি (সা.) বললেন: "তাহলে তোমার মায়ের পক্ষ হতে রোযা রাখ"* (মুসলিম), আব্দুল্লাহ্ বিন আল-যুবায়ের কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্কে (সা.) জিজ্ঞেস করেছিল: *"হে আল্লাহ্'র রাসূল, যখন ইসলাম এসেছিল তখন আমার বাবা একজন বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন এবং পশুর পিঠে চড়তে পারেননি, আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ্ব পালন করতে পারি? তিনি (সা.) বললেন: "তোমার বাবার যদি কোন ঋণ থাকে এবং তুমি তা পরিশোধ করে দাও তবে কি সেটা তোমার বাবার জন্য যথেষ্ট হবে?" লোকটি বলল: "জ্বী"। সুতরাং তিনি (সা.) বললেন: তাহলে তোমার বাবার পক্ষ হতে হজ্জ্ব পালন কর"* (আল-যাইন কর্তৃক বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃত একটি সনদ সহকারে আহ্মেদ কর্তৃক বর্ণিত এবং একইভাবে আল-দারিযি কর্তৃক বর্ণিত)।

এই দুটি বর্ণনাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রোযা ও হজ্জ্বের বিষয়ে আল্লাহ্'র নিকট যে ঋণ রয়েছে সেটার সাথে মানুষের ঋণকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন এবং তারা উভয়ই একটি পরিচিত বিষয়ের সাথে আরেকটি পরিচিত বিষয়ের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত; এর অর্থ হচ্ছে যে, আল্লাহ্'র প্রতি ঋণের সাথে মানুষের প্রতি ঋণের সম্বন্ধ এটাই নিশ্চিত করে যে, একজনের পক্ষ থেকে আরেকজন তা পরিশোধ করলে তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। এটা এরকম হওয়ার কারণ হলো এখানে উভয় বিষয় হচ্ছে ঋণ; অতএব তাদের মধ্যে সার্বজনীন উপাদান হচ্ছে ঋণ এবং এক্ষেত্রে এটিই *ইল্লাহ্* এবং তাদের উভয়ের জন্য যে হুকুমটি প্রযোজ্য সেটি হচ্ছে ঋণের নিষ্পত্তির জন্য তা পরিশোধ করাই যথেষ্ট। *শারী'য়াহ্* উৎস হতে উদ্ভুত *শারী'য়াহ্* মোতাবেক এটাই হচ্ছে *ক্বিয়াসে'র* বাস্তবতা। অতএব এই সংজ্ঞাটি *শারী'য়াহ্*'র হুকুম এবং এটি অবশ্যই বাস্তবায়িত করতে হবে, এবং যে ব্যক্তি হুকুমটি খুঁজে বের করবে এবং তাকে অনুসরণকারী *মুত্তাবি* (যে *মুকাল্লিদ্* দলিল সম্পর্কে অবগত হতে চায়) কিংবা *আম্মি'র* (যে *মুকাল্লিদ্* দলিল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে না) জন্য তা অনুসরণ করা বাধ্যতামূক। এটা *শারী'য়াহ্* দলিল থেকে উদ্ভুত অন্যান্য *শারী'য়াহ্* হুকুমের মতোই। কারণ *শারী'য়াহ্* দলিল হতে উদ্ভুত *শারী'য়াহ্* সংজ্ঞাসমূহ ও মূলনীতিসমূহ অন্যান্য *শারী'য়াহ্* হুকুমের মতোই *শারী'য়াহ্* হুকুম হিসেবে বিবেচিত হয়।

*ইল্লাহ্*র ভিত্তিতে, অথবা ভিন্ন শব্দে, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত পরিচিত বিষয় এবং পরিচিত যে বিষয়ের সাথে এটি সম্পর্কিত; অর্থাৎ মূল ও শাখার মধ্যকার সাদৃশ্যপূর্ণ উপাদানের ভিত্তিতে *ক্বিয়াস* করা হয়। অতএব, যদি *ইল্লাহ্* পাওয়া যায়, অর্থাৎ যদি তুলনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ উপাদান পাওয়া যায় তবে *ক্বিয়াস* করা যায়। অন্যথায় *ক্বিয়াস* করার কোন সুযোগ নেই। এই *ইল্লাহ্* তখনই *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে যদি তা *শারী'য়াহ্* উৎসে উল্লেখ থাকে, কিংবা যদি এটা *শারী'য়াহ্* উৎসের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। কারণ, *শারী'য়াহ্*তে উল্লেখকৃত *ইল্লাহ্*র ভিত্তিতে *ক্বিয়াস* করা হয়।

বিপরীতভাবে, যদি এই *ইল্লাহ্* কোন *শারী'য়াহ্* উৎসে উল্লেখ না থাকে এবং *শারী'য়াহ্* উৎসে উল্লেখকৃত *ইল্লাহ্*র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয় তবে এ ধরনের *ক্বিয়াস* বৈধ হিসেবে কিংবা *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে না। এটা এরকম হওয়ার যুক্তি হলো, যে কারনের উপর ভিত্তি করে এটা উদ্ভুত হয়েছে তা *শারী'য়াহ্* উৎসে উল্লেখ করা হয়নি। অতএব, এই *ক্বিয়াস শারী'য়াহ্* থেকে হতে পারে না এবং ফলশ্রুতিতে এটা *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবেও বিবেচিত হবে না।

ক্বিয়াস শারী'য়াহ্ দলিল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দলিল হচ্ছে যে *শারী'য়াহ্* উৎসে এর *ইল্লাহ্*র উল্লেখ রয়েছে, অথবা *শারী'য়াহ্* উৎসে উল্লেখিত *ইল্লাহ্*র সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে; আর এটা শুধুমাত্র *কুর'আন*, *সুন্নাহ্* বা সাহাবাদের *ইজ্‌মা* হতে আসতে পারে। এই তিনটি *শারী'য়াহ্* উৎস চুড়ান্তভাবে প্রমানিত দলিলের দ্বারা *শারী'য়াহ্* উৎস হিসেবে সুনিশ্চিত হয়েছে। এটা এরকম হওয়ার কারণ হচ্ছে, *শারী'য়াহ্* উৎসে উল্লেখিত হুকুমে *শারী'য়াহ্* কারণ পাওয়া যায় যা মূল হিসেবে বিবেচিত হয় এবং শাখার ক্ষেত্রে এটি হুকুমটিকে *শারী'য়াহ্* হুকুম হিসেবে নির্ধারণ করে, আর এটি *ক্বিয়াস* করাকে সম্ভব করে তোলে এবং এটা ব্যতিত *ক্বিয়াস* করা সম্ভবপর হতো না। তাই এর দলিল *ক্বিয়াসের* জন্যও দলিল হিসাবে কাজ করে।

এই *শারী'য়াহ্ ক্বিয়াস* আল্লাহ্'র রাসূল (সা.) আমাদেরকে শিখিয়েছেন এবং তিনি (সা.) এটাকে *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সাহাবীগণ এটা অনুসারে অগ্রসর হয়েছেন এবং যখন তারা *শারী'য়াহ্ আহ্‌কাম* বের করেছেন তখন এটাকে *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে গ্রহন করেছেন। এটা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মু'আয এবং আবু মুসা আল আশ্‌আরিকে ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: *"তোমরা কি দিয়ে বিচার করবে?" তারা বলেছিল: "যদি আমরা কুর'আনে কিংবা সুন্নাহ্‌তে হুকুম খুঁজে না পাই তবে দুটি বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে বের করব এবং যেটা সত্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সেটার ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিব"* (আল-আমিদি কর্তৃক আল আহ্‌কামে এবং আবু আল-হুসেইন কর্তৃক আল মু'তামিদ-এ উল্লেখ করা হয়েছে)। এখানে মু'আয ও আবু মুসা প্রকাশ্যে বলেছেন যে, তারা *ক্বিয়াস* ব্যবহার করবেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এটার অনুমোদন দিয়েছেন। অতএব, এটা প্রমাণিত হয় যে *ক্বিয়াস* একটি *শারী'য়াহ্* দলিল।

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আছে যে, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এসেছিল এবং বলেছিল: *"আমার মা মারা গিয়েছেন এবং তার এক মাসের রোযা অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে"। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছিলেন: "যদি তোমার মায়ের কোন ঋণ থাকে তবে কি তুমি তা পরিশোধ করতে?" তখন উত্তরে মহিলাটি বলেছিল "জ্বী", তখন তিনি (সা.) বলেছিলেন: "আল্লাহ্'র ঋণ পরিশোধ করাই অধিকতর উত্তম"* (আল বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এই মহিলাটিকে শেখাতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি (সা.) ঋণ পরিশোধের দায়িত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহ্'র ঋণের সাথে মানুষের ঋণকে সংযুক্ত করেছেন যা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় এবং যথার্থভাবে এটিই *ক্বিয়াস*। উমর বিন আল-খাত্তাব হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা.) রোযাদার ব্যক্তির চুম্বন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, চুম্বনের ফলে রোযা ভেঙ্গে যায় কিনা? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জিজ্ঞেস করেছিলেন: *"রোযা অবস্থায় তুমি যদি মুখে পানি নিয়ে কুলি কর তবে কি সেটা তোমার রোযা ভেঙ্গে দেয়? তিনি উত্তরে বলেছিলেন: "না"* (আল হাকিম কর্তৃক এর বিশ্বাসযোগ্যতা অনুমোদিত ও আল দাহাবি কর্তৃক নিশ্চিত হয়েছে)। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রোযা অবস্থায় কুলি করার সাথে রোযা অবস্থায় চুম্বন করাকে তুলনা করেছিলেন এবং যেরূপভাবে কুলি করলে রোযা ভাঙ্গে না সেরূপভাবে চুম্বন করলে রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার নিয়মকে বাতিল করে দিয়েছেন, কারণ এদুটোর মধ্যে কোনটিই পেটে প্রবেশ করে না। অতএব, এটি *ক্বিয়াস* ব্যবহারের মাধ্যমে হুকুমে পৌঁছানোর একটি ব্যাখ্যা ছিল।
অনেক দলিল রয়েছে যেগুলো *ক্বিয়াসকে* নির্দেশ করে এবং সেগুলোর মতো এই তিনটি বর্ণনায় আসা হুকুমটি শুধুমাত্র একটি *ইল্লাহ্*ই প্রদান করেনি বরং এগুলোর মাধ্যমে *ক্বিয়াস* অনুমোদিত হয়েছে, *ক্বিয়াস* করা শিখানো হয়েছে এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা *ক্বিয়াসকে* একটি *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠার পক্ষে বৈধ যুক্তি হিসেবে ভূমিকা রেখেছে।

এটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনা। সাহাবাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, অনেক বিষয়ে তারা *ক্বিয়াসকে* *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আল কাদিম বিন মুহাম্মাদ হতে সাঈদ বিন মানসুর তার সুনানে যা বর্ণনা করছেন তা *ক্বিয়াসের* একটি উদাহরণ: *"একজন ব্যক্তি মারা যায় এবং সেসময়ে সে তার দুজন দাদী-নানী, অর্থাৎ তার মায়ের আম্মা ও তার বাবার আম্মাকে রেখে যায় এবং আবু বকর এসে তার নানীকে ছয় ভাগের একভাগ প্রদান করেন, আর তার দাদিকে কিছুই দেননি এবং আনসারদের মধ্য হতে একজন তাকে জিজ্ঞেস করেন যে: "আপনি এমন একজন মহিলাকে একজন মৃত ব্যক্তির সম্পদ প্রদান করেছিলেন যে (মহিলাটি) মারা গেলে সেই ব্যক্তি (মৃত ব্যক্তিটি) তার উত্তরাধিকার হতো না; এবং আপনি সেই মহিলাকে বাদ দিয়েছেন যে মারা গেলে তার সকল সম্পদের উত্তরাধিকার সেই ব্যক্তিটি (মৃত ব্যক্তি) হতো", সুতরাং তিনি তাদের মধ্যে ষষ্ঠ অংশটি ভাগ করে দিলেন*। এই ঘটনাটি আল-ঘাযালি কর্তৃক আল-মুসতাসকা এবং আল-আমিদি কর্তৃক আল-ইহকাম-এ উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সাহাবাগণ মৃত ব্যক্তিতে জীবিত এবং জীবিত ব্যক্তিকে মৃত ধরে নিয়ে মৃত ব্যক্তি হতে জীবিত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের সাথে জীবিত

ব্যক্তি হতে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের তুলনা করেছেন; অতএব, এই সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া গেছে যে উভয় ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়, অর্থাৎ দুজন ব্যক্তির মধ্যে আত্নীয়তার সম্পর্ক একই। যখন আবু বকর এই *ক্বিয়াসটি* সম্পর্কে অবহিত হন তখন তিনি নিজের মতামত পরিত্যাগ করে এটিকে গ্রহণ করেন এবং বাস্তবায়ন করেন।

উমর (রা.) আবু মুসা আল-আশ'আরিকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটাতেও একই রকম বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি (রা.) লিখেছিলেন: *"সাদৃশ্যপূর্ণ ও অভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিচিত হও এবং অতঃপর তোমার মত অনুযায়ী তাদের মধ্যে তুলনা কর"* (এটি আল-সিরাজী কর্তৃক তাবাকাত আল-ফুকাহায় উল্লেখিত আছে এবং আল-বাইহাকি কর্তৃক আল-মারিফা মিন কিতাব আদাব আল-কা'দিতে বর্ণিত হয়েছে), সেসময় উমর (রা.) বিশ্বাসীদের আমির ছিলেন এবং আবু মুসা বিচারক ছিলেন। একইভাবে উমরকে (রা.) বলা হয়েছিল যে, সামরা কর হিসেবে ইহুদী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মদ নিয়েছেন এবং সেটাকে তিনি ভিনেগারে রূপান্তর করে বিক্রি করে দিয়েছেন। তখন উমর (রা.) বলেছিলেন: *"সামরার উপর আল্লাহ্'র অভিশাপ, সে কি জানে না যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: "আল্লাহ্ ইহুদীদের অভিশপ্ত করুন; তাদের জন্য চর্বিকে হারাম করা হয়েছিল, তাই তারা সেগুলোকে সুশোভিত করেছিল ও বিক্রি করে দিয়েছিল এবং সেটা থেকে ভক্ষণ করেছিল"* (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত), এখানে উমর (রা.) মদের সাথে চর্বিকে তুলনা করেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এটি ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা এটির বিক্রয়কেও নিষিদ্ধ করে। আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে: উমর (রা.) একজন লোককে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত সাতজন ব্যক্তির শাস্তি কি হবে এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না, তখন আলী (রা.) তাকে বলেছিলেন: *"হে বিশ্বাসীদের আমির! যদি একদল লোক সম্মিলিতভাবে চুরি করে তবে কি আপনি তাদের সকলের হাত কাটবেন? তিনি বলেছিলেন: "জ্বী"। তাই আলী (রা.) তাকে বলেন: "এক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরকম"* (আবদ-আল রাজ্জাক কর্তৃক আল-মুসান্নাফ-এ উল্লেখ করা হয়েছে)। এটা হচ্ছে হত্যা ও চুরির মধ্যে *ক্বিয়াস* করা এবং এ সবকিছু এটাই নির্দেশ করে যে, *ক্বিয়াস* হচ্ছে *সুন্নাহ্* ও সাহাবাদের *ইজ্‌মা* হতে উদ্ভুত একটি *শারী'য়াহ্* দলিল। যাহোক, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক যেটা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়েছে সেটা *সুন্নাহ্* এবং সাহাবাগণ কর্তৃক যা নিশ্চিত হয়েছে তা *"ইজ্‌মা' সুকুতি"* (নীরব সম্মতি) হিসেবে বিবেচিত হয়, কারণ যেসব সাহাবাগণ *ক্বিয়াস* করেছেন সেসব সাহাবাগণ অন্যান্য সাহাবাদের উপস্থিতিতে এবং তাদের পূর্ণাঙ্গ সম্মতিতেই তা করেছেন। এবং তাদের মধ্যে কেউই তার নিন্দা করেননি। অতএব এটা ছিল একটি সাধারণ ঐক্যমত্য।

যাহোক, *সুন্নাহ্* এবং সাহাবাদের *ইজ্‌মা* উভয়ই ব্যক্তিগত (*আহাদ্*) প্রতিবেদনের মতো বর্ণিত হয়েছে, তাই এগুলো অনির্দিষ্ট/চুড়ান্তভাবে প্রমাণিত নয়- এরূপ দলিল হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। অতএব, *ক্বিয়াস* যে একটি *শারী'য়াহ্* দলিল সে বিষয়ে চুড়ান্তভাবে প্রমাণিত দলিলটি প্রতিফলিত হয় *শারী'য়াহ্* উৎসে, অর্থাৎ *কুর'আন*, *সুন্নাহ্* বা সাহাবাদের *ইজ্‌মা'য়* উল্লেখিত *"ইল্লাহ্"* অনুযায়ী। এই তিনটি দলিল চূড়ান্তভাবে প্রমানিত দলিলের মাধ্যমে *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে নিশ্চিত হয়েছে। অতএব, যেহেতু এগুলো *ইল্লাহ্‌*র জন্য দলিল সেহেতু এগুলো *ক্বিয়াসে'র* ক্ষেত্রেও দলিল হিসেবে কাজ করে।

এটা চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত যে - *কুর'আন*, *সুন্নাহ্*, সাহাবাদের *ইজ্‌মা'* এবং *ক্বিয়াস*-এই চারটি দলিল আল্লাহ্'র (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) নাযিলকৃত ওহীর মতো করে এসেছে। এই চারটি ব্যতিত অন্য কোন দলিল চূড়ান্তভাবে প্রমানিত দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটি পরিষ্কার যে, অন্যান্য দলিলসমূহ চূড়ান্তভাবে প্রমানিত দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়, কারণ যারা সেগুলোকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করে তারা দাবি করেনা যে সেগুলোর *শারী'য়াহ্* দলিল চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত। তারা তাদের বিবেচনা অনুযায়ী যেসব *শারী'য়াহ্* প্রমাণের ভিত্তিতে দলিল প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে সেসব যে বাস্তবিকভাবে কোন চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত *শারী'য়াহ্* দলিল নয় তা তাদের দ্বারা পেশকৃত দলিলের মধ্যকার সাদৃশ্যের ঘাটতি হতেই পরিস্কার হয়ে যায়। ভিন্ন শব্দে বলা যায়, এটা সুস্পষ্ট যে তাদের দাবিকৃত দলিলের ভিত্তিতে যা তারা উপস্থাপন করে তাতে ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান, আর এ দলিলগুলো হচ্ছে: মুসলিমদের ঐক্যমত্য, *আল-মাসালিহ্ আল-মুরসালাহ্*, কিংবা *আল-ইস্‌তিহ্‌সান* এবং *শারী'য়াহ্* দলিল হতে আসা এগুলোর মতো একই ধরনের বিষয়সমূহ।

সুতরাং যারা দাবি করে যে মুসলিমদের ঐক্যমত্য হচ্ছে *শারী'য়াহ্* দলিল, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই হাদিসটি থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছায়: *"আমার উম্মত বিপথগামীতার উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে না"*। ইবনে হাজ্‌র অনেকগুলো ভিন্ন সনদ সহকারে বর্ণনাটিকে মাশহুর হিসেবে উল্লেখ করেছেন; যদিও সবগুলোর ক্ষেত্রেই মতভেদ রয়েছে। এবং এখানে বিপথগামীতা বলতে ভুল নয়, বরং *দ্বীন* থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া বুঝিয়েছে এবং এই অর্থ ধারণ করেই এই বর্ণনাতে বলা হয়েছে যে: *"আমার উম্মত বিপথগামীতার (দালালাহ্) উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না, এবং একটি দলের (জামাতের) সাথে থাক, কারণ দলটির সাথে আল্লাহ্'র সাহায্য রয়েছে"* (আল-তাবারানি কর্তৃক এমন একটি সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে যার অন্তর্গত সকলেই ইবনে উমর কর্তৃক বিশ্বাসযোগ্য)। এটা সঠিক যে, ইসলামী উম্মাহ্ কখনই ইসলাম ধর্ম ত্যাগের উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না। তবে, তারা কোন একটি ভুলের উপর একতাবদ্ধ হতে পারে এবং তার একটি সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে, ইসলামী *উম্মাহ্* দীর্ঘকাল ধরে ঐক্যবদ্ধভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজ থেকে বিরত ছিল এবং সেটা ছিল ভুলের উপরে তাদের ঐক্যমত্য।

যারা বলে যে *শারী'য়াহ্* হুকুমের ক্ষেত্রে কল্যাণ/উপকার নিশ্চিত করা ও ক্ষয়ক্ষতি প্রতিহত করা *শারী'য়াহ্ ইল্লাহ্* হিসেবে বিবেচিত হবে এবং যারা এই ইল্লাহ্ অনুযায়ী *ক্বিয়াস* করে তারা আল্লাহ্'র (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) এই বানী হতে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে: *"আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতস্বরূই প্রেরণ করেছি"* (সূরা আম্বিয়া: ১০৭)। অতএব, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে আল্লাহ্'র রহমতস্বরূপ - এ বিষয়টিকে তারা *শারী'য়াহ্ ইল্লাহ্* হিসেবে বিবেচনা করে এবং তারা মনে করে যে, কল্যাণ প্রাপ্তি এবং ক্ষতি হতে মুক্তি ব্যতিরেকে রহমত সম্ভব নয়, আর এই জন্যেই আইন প্রনয়নের জন্য এটি *শারী'য়াহ্ ইল্লাহ্* হিসেবে বিবেচিত হবে। দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই অনুমান ভুল, প্রথমটি হচ্ছে: নবী হিসেবে তাঁকে (সা.) প্রেরণ, কিংবা ভিন্ন শব্দে বলা যায়, বাস্তবিকভাবে তিনি (সা.) যে একজন নবী ছিলেন- এটি কোন *শারী'য়াহ্* আইন নয়। যদি আমরা এটা ধরে নেই যে তাকে (সা.) প্রেরনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তার (সা.) প্রচারিত বার্তা অর্থাৎ *শারী'য়াহ্*, তবে সেক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে *আক্বীদাহ্* ও বিধানসমূহের বিষয়বস্তু হতে উদ্ভুত পূর্ণাঙ্গ *শারী'য়াহ্* হবে এবং শুধুমাত্র *শারী'য়াহ্* বিধান হওয়ার কোন সুযোগ নেই। দ্বিতীয়টি হচ্ছে: তাকে (সা.) এই মহাবিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরনের বিষয়টি শুধুমাত্র রাসূল প্রেরনের *হিক্‌মার* (জ্ঞান) ব্যাখ্যা; ভিন্ন শব্দে, তাঁকে (সা.) প্রেরনের ফলে কি ঘটতে পারে। একইভাবে, আল্লাহ্'র বানীতে আসা শব্দে: *"আমি সৃষ্টি করেছি জ্বীন ও ইনসানকে কেবলমাত্র এজন্য যে, যেন তারা আমারই ইবাদত করে"* (যারিয়াত: ৫৬), ভিন্ন শব্দে, এদেরকে সৃষ্টির ফলাফল হচ্ছে ইবাদত, সুতরাং এটাই হচ্ছে তাদের সৃষ্টির *হিক্‌মা*, তাদেরকে সৃষ্টির *ইল্লাহ্* নয়। একইভাবে আল্লাহ্'র (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বানীতে আসা শব্দে: *"যাতে তারা সেসব জিনিসের সাক্ষী হতে পারে যেগুলো তাদের জন্য কল্যাণকর"* (সূরা আল-হাজ্ব: ২৮), আয়াতটি হজ্জের *হিক্‌মা'*কে বর্ণনা করে, অর্থাৎ হজ্জ থেকে কল্যাণ অর্জন হতে পারে। তিনি (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"নিশ্চয় অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে সালাত বিরত রাখে"* (সূরা আন-কাবুত: ৪৫)। এটা নামাযের *হিক্‌মা'*কে বর্ণনা করেছে, ভিন্ন শব্দে, নামায থেকে যে কল্যাণ অর্জন করা যেতে পারে এবং এরূপভাবে অন্যগুলোও। অতএব, এখানে আয়াতটি কোন *ইল্লাহ্*'কে নির্ধারণ করে দেয়ার প্রেক্ষাপটে আসেনি, কারণ *ইল্লাহ্* হচ্ছে সেই কারণ যার উপস্থিতির ফলে হুকুম প্রযোজ্য হয়; বা ভিন্ন শব্দে হুকুম বিধিবদ্ধ হয়। *শারী'য়াহ্* উৎসের মধ্যকার অন্তর্নিহিত *ইল্লাহ্* বুঝতে হলে এটা বাধ্যতামূলক যে, এটাকে অবশ্যই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে এবং এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি অবশ্যই অন্তর্নিহিত *ইল্লাহ্*'র দিকে নির্দেশ করবে, এবং সেখানে এই *ইল্লাহ্* হচ্ছে হুকুমসমূহের জন্য *সাবাব* (কারণ), ভিন্ন শব্দে বলা যায় যে এই *ইল্লাহ্*'র জন্যই হুকুমটির উপস্থিতি এবং এ ধরনের ঘটনায় এটা একটি অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য যা কখনও অনুপস্থিত হয় না। অতএব, কারণটি অবশ্যই সবসময় ফলস্বরূপ কোন একটি প্রভাবের জন্ম দেবে এবং সেজন্যই যদি *ইল্লাহ্* পাওয়া যায় তবে সংশ্লিষ্ট হুকুমও পাওয়া যাবে।

"বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ" (সূরা আম্বিয়া: ১০৭) - আয়াতটিতে আসা শব্দসমূহে এবং পূর্বে উল্লেখিত অন্যান্য আয়াতসমূহে, যদিওবা সেগুলো বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয় এবং আয়াতসমূহের শব্দের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত *ইল্লাহ্*'র উপস্থিতি থাকতে পারে, তথাপি শব্দসমূহের প্রসঙ্গ কোন *ইল্লাহ্*'র উপস্থিতির দিকে নির্দেশ করে না, কারণ তা অনুপস্থিত থাকতে পারে, যেহেতু সেগুলো আইনের জন্য আসেনি। তদনুসারে, যে ইসলামী *শারী'য়াহ্*তে বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে তার জন্য রহমত হতে পারে, উদাহরস্বরূপ: মুসলিমদের সর্বপ্রথম প্রজন্ম এবং ইসলামী *শারী'য়াহ্* সেই ব্যক্তির জন্য পরিতাপের বিষয় হতে পারে যে এতে অবিশ্বাস করবে, যেমন: অবিশ্বাসীরা। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রেরণ অবিশ্বাসীদের জন্য ছিল দুঃখের বিষয় এবং তারা আলামিন (বিশ্বজগতের) অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, ইসলামের বাণী আজকের যামানাতেও বিদ্যমান,

বস্তুত রাসূল প্রেরনের সময় হতে এটা বিদ্যমান এবং এর সাথে সাথে যে সব মুসলিম এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা বর্তমানে কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। অতএব, এটা রাসুল প্রেরণ নয় বরং এককভাবে *শারী'য়াহ্*'র অস্তিত্বকে নির্দেশ করে যা রহমত ও করুনাস্বরূপ এবং এ কারনেই এটা এক্ষেত্রে এর *ইল্লাহ্* নয়। এর ভিত্তিতে কল্যাণ লাভ করা ও ক্ষয়ক্ষতিকে প্রতিহত করা *শারী'য়াহ্ ইল্লাহ্* হিসেবে বিবেচিত হবে না। অতএব, এটাকে *ক্বিয়াসের* ভিত্তি হিসেবে গ্রহন করা যাবে না।

যারা বলে যে যৌক্তিকতা হচ্ছে *শারী'য়াহ্* দলিল, তাদেরকে বলা যায় যে - আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে *শারী'য়াহ্* বিধান, অথবা যা আল্লাহ্ প্রদত্ত সবচেয়ে সম্ভাব্য *শারী'য়াহ্* হুকুম হিসেবে বিবেচিত হয়। এটা ওহী ব্যতিত অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না এবং ওহী যৌক্তিকতাকে উল্লেখ করেনি এবং একারনেই এমন কোন চূড়ান্তভাবে প্রমানিত বা অপ্রমানিত কোন দলিলই নেই যেখানে বলা হয়েছে যে যৌক্তিকতা হচ্ছে *শারী'য়াহ্* দলিল, যা ব্যবহার করে *শারী'য়াহ্* হুকুমে উপনীত হওয়া সম্ভব; সুতরাং *শারী'য়াহ্* দলিল হতে এটা এসেছে বলে বিবেচিত হবে না।

যারা দাবি করে যে, কোন একজন সাহাবার একক মতামত *শারী'য়াহ্* দলিল, তারা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে এটা বলে যে - সাহাবাদের *ইজ্‌মা'র* ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দুটি দলিল একজন সাহাবার মতামতের উপরও প্রযোজ্য হবে, কারণ সম্মিলিতভাবে তারা প্রশংসনীয় মানে হচ্ছে তাদের একজন এককভাবেও প্রশংসিত। একইভাবে, যেহেতু সম্মিলিতভাবে তাদের দ্বারা বহনকৃত *দ্বীনের* মধ্যে কোন ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে না সেহেতু তাদের মধ্য হতে একজন যা বহন করবে তাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। এছাড়াও আল্লাহ্'র রাসুল (সা.) বলেছেন: *"আমার সাহাবীরা তারকার মতো, তাদের মধ্যে যেকাউকে অনুসরণ করলেই তোমরা সঠিক পথ পেয়ে যাবে"*- এই হাদিসটিও যেকোন একজন সাহাবীর মতামতকে দলিল হিসেবে সমর্থন করে। এই সিদ্ধান্তটি সঠিক নয়, কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক সাহাবাদের জন্য প্রশংসার বিষয়টি এককভাবে ছিল না বরং সম্মিলিতভাবে সকলের জন্য ছিল, যা সাহাবাদের *ইজ্‌মা'*কে *শারী'য়াহ্*'র দলিল হিসেবে প্রমানিত করে এবং বাস্তবতা হচ্ছে যে সাহাবারা ব্যক্তিগতভাবে *কুর'আন*কে বহন করেননি আর এটা প্রমান করে যে তাদের ঐক্যমত্য হচ্ছে *শারী'য়াহ্*'র দলিল। বরং *শারী'য়াহ্* দলিল হচ্ছে: তাদের জন্য প্রশংসা এবং কোন একটি হুকুম যে *শারী'য়াহ্* হুকুম সে বিষয়ে তাদের সম্মিলিত ঐক্যমত্য। সুতরাং দলিলটিতে দুটি বিষয় বিদ্যমান - প্রশংসা এবং ঐক্যমত্য, আর কোন একজন সাহাবীর মতামতে এই দুটি জিনিস একত্রে অনুপস্থিত। যে ক্ষেত্রে প্রশংসা এবং *কুর'আন* বহনের বিষয়টি প্রমাণ হিসাবে যথোপযুক্ত নয় সেটি হচ্ছে – আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) যাদের প্রশংসা করেছেন তাদের মধ্য হতে যিনিই *কুর'আন* বহন করেছেন তার এককভাবে বলা কোন বক্তব্য *শারী'য়াহ্* দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে না, কারণ যেভাবে আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) সাহাবাদের প্রশংসা করেছেন সেভাবে তিনি (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) তাদেরও প্রশংসা করেছেন যারা সাহাবাদের অনুসরণ করেছে। তাই এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) যাদের প্রশংসা করেছেন তারাও যদি *কুর'আন* বহন করে থাকে তবে তাদের কোন একজনের বক্তব্য *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং একারণে একজন সাহাবীর বক্তব্য *শারী'য়াহ্* দলিল – এ সিদ্ধান্তটি অবৈধ। এই সিদ্ধান্তটির অসাড়তা যে বিষয়টি নির্দেশ করে তা হচ্ছে: একজন সাহাবী যা বহন করেছেন এবং হাদীসসমূহ হতে যা বর্ণনা করেছেন তা চূড়ান্তভাবে প্রমানিত দলিল হিসেবে বিবেচিত হয় না– বরং তা চূড়ান্তভাবে প্রমানিত নয় বলেই গন্য হয়। এজন্যই *"যদি প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও নারী যিনা করে তবে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা কর"* – এই বিবৃতিটি *কুর'আনের* আয়াত হিসেবে বিবেচিত হয় না, যদিওবা এটা একজন সাহাবী বহন করেছেন। কারণ এর উপর সাহাবাদের *ইজ্‌মা* ছিল না। একইভাবে, যেসব হাদীসসমূহ সাহাবাদের দ্বারা এককভাবে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হিসেবে বিবেচিত হয়না, বরং সেগুলো চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত নয় বলেই গন্য হয়ে থাকে।

এটা সাহাবীদের *ইজ্‌মা* হতে ভিন্ন, কারণ তাঁরা সকলে সর্বসম্মতিক্রমে *কুর'আন* সম্পর্কে একমত একথার অর্থ হচ্ছে যে এটা *কুর'আন* এবং চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত, আর যে বর্ণনা সম্পর্কে তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে একমত এবং একাধিক ধারাবাহিক সনদ সহকারে বা *মুতাওয়াতির* হিসেবে বর্ণিত হয়েছে তা চূড়ান্তভাবে প্রমানিত দলিল হিসেবে পরিগনিত হয়। একইভাবে, সাহাবাগণ যে বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একমত হয়েছেন - তাদের মধ্যে কোন ধরনের মতপার্থক্য নেই, অর্থাৎ তা চূড়ান্তভাবে প্রমানিত এবং যে এটাকে অস্বীকার করবে সে অবিশ্বাসী - এবং - যে বিষয়টি শুধুমাত্র একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত নয় এবং যে এটাকে অস্বীকার করবে সে অবিশ্বাসী হিসেবে পরিগনিত হবে না - এ দুয়ের

মধ্যে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। অতএব, সাহাবাদের *ইজ্‌মা শারী'য়াহ্‌* দলিল হিসেবে বিবেচিত হয় এবং একজন সাহাবীর মতামত *শারী'য়াহ্‌*'র দলিল হিসেবে বিবেচিত হয় না। এর সাথে সাথে সাহাবারা, যারা সম্মিলিতভাবে কোন ভুলের উপরে ঐক্যমত্যে পৌঁছুতে পারেন না, তাদের *ইজ্‌মা'র* বিপরীতে একজন সাহাবী ভুল করতে পারেন এবং সেটা থেকে তিনি মুক্ত নন। সাহাবাগণও বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষন করতেন এবং তাদের প্রত্যেকেই অন্যদের চেয়ে ভিন্ন মতামত গ্রহন করেছিলেন। সুতরাং, যদি একজন সাহাবীর মতামত দলিল হতো তবে আল্লাহ্‌'র (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) দলিল প্রমাণে মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব দেখা দিত। সুতরাং, একজন সাহাবীর মতামত *শারী'য়াহ্‌* দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে না।

যারা একথা বলে যে, "আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপরে নাযিলকৃত শারী'য়াহ্‌ আমাদের জন্যও প্রযোজ্য"- তারা এর দলিল হিসেবে আল্লাহ্‌'র (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) এই আয়াতটি ব্যবহার করে: *"নিশ্চয়ই আমরা আপনার প্রতি সেরূপ ওহী প্রেরণ করেছি যেরূপ নুহ ও তার পরবর্তী নবীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম"* (সূরা নিসা : ১৬৩); *"তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন সে দ্বীনকে যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহ্‌কে"* (সূরা শুরা : ১৩); এবং *"তারপর আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে আপনি একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করুন"* (সূরা নাহ্‌ল : ১২৩)।

এই আয়াতগুলো নির্দেশ করে যে, পূর্ববর্তী নবীগণের *শারী'য়াহ্‌* দ্বারা আমাদেরকে আদিষ্ট করা হয়েছে। সেইসাথে, রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ আমাদের জন্য যে বিধান মনোনিত করেছেন সে সম্পর্কে অবহিত করা, এজন্য *কুর'আনের* প্রতিটি অক্ষর এবং রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) প্রতিটি কাজ, তাঁর (সা.) মুখ দিয়ে উচ্চারিত যেকোন শব্দ, অথবা তাঁর (সা.) অনুমোদিত যে কোন কিছু মেনে চলা বাধ্যতামূলক, তবে যা শুধুমাত্র তাঁর (সা.) জন্য কিংবা তিনি (সা.) ব্যতিত অন্য কারও জন্য সুনির্দিষ্ট নয় তা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং, পূর্ববর্তী *শারা'ঈ* (*শারী'য়াহ্‌*'র বহুবচন) অনুসারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো ব্যতিত কুর'আনে যা উল্লেখ করা আছে, বা বর্ণনায় যা এসেছে তা মেনে চলতে আমরা আদিষ্ট হয়েছি। এবং যেহেতু আল্লাহ্‌ (সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা) কোন কারণ ব্যতিরেকে *কুর'আনে* কোন কিছু উল্লেখ করেননি সেহেতু কোন বিষয়ে সেভাবে কিছু উল্লেখ না থাকলেও তা মেনে চলতে আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, এগুলোর মাধ্যমে অবশ্যই আমাদেরকে আদিষ্ট করা হয়েছে।

এই অনুমান সঠিক নয়। উপরোক্ত আয়াতসমূহের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রথম আয়াতটি নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে: অন্যান্য নবীদেরকে *যেভাবে ওহী নাযিল করা হয়েছিল* সেভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর প্রতিও একইভাবে ওহী নাযিল করা হয়েছে; এবং দ্বিতীয় আয়াতটি নাযিলের উদ্দেশ্য হলো যে: এতে *তাওহীদের* (আল্লাহ্‌ সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলার একত্ববাদের উপর বিশ্বাসের) ভিত্তিকে আইনগতভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এবং নূহ'কে (আ:) এই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। তৃতীয় আয়াতটির অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে: *তাওহীদের* মূলকে অনুসরণ করা, কারণ *"মিল্লাহ্‌"* শব্দটির অর্থ হচ্ছে - *তাওহীদের* মূল। এধরনের সকল আয়াত একই রকমের অর্থ বহন করে, উদাহরণস্বরূপ তাঁর (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'য়ালা) বানীতে আসা শব্দে: *"অতএব আপনিও তাদের পথে চলুন"* (সূরা আন'আম: ৯০); এবং অন্যান্য আয়াতসমূহেও, তিনি (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেছেন: *"সত্যই, আমি তো নাযিল করেছিলাম তাওরাত যাতে ছিলো হেদায়েত ও আলো, এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌'র অনুগত নবীরা ফয়সালা প্রদান করত"* (মায়িদাহ: ৪৪)। আল্লাহ্‌ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) এই আয়াতে বলেছেন যে, তাঁরা হচ্ছেন ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেরিত নবীগণ, মুহাম্মদ (সা.) নন এবং মুসলিমদের শুধুমাত্র একজন নবীই প্রেরিত হয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন: *"নবীরা আল্লাত (অর্থাৎ, আলাদা মা) হতে পরস্পরের ভাই, তাঁদের মা ভিন্ন কিন্তু তাদের দ্বীন একটিই"* (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত); *"তাদের দ্বীন একটিই"*- এর অর্থ হচ্ছে যে, *তাওহীদ* হলো ভিত্তি - যেটা ভিন্ন নয়। এটা হতে এই অর্থ প্রকাশ পায় না যে, এই *দ্বীন* হতে যা এসেছে তা তাদের সকলের ক্ষেত্রে অভিন্ন, বরং আমরা তাঁর (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বাণীতে আসা শব্দ হতে এর বিপরীত ধারণা পাই: *"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছি নির্দিষ্ট শারী'য়াহ্‌ ও নির্দিষ্ট পন্থা"* (মায়িদাহ: ৪৮)। এ আয়াত হতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এই দলিলসমূহ হতে কোন কিছু অনুমান করা উচিত নয় এবং এসব আয়াতের ভিত্তিতে আমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য মনোনীত *শারী'য়াহ্‌* আমাদের জন্যও প্রযোজ্য-এ সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া সঠিক নয়।

অপরদিকে, এরূপ দলিল বিদ্যমান যা চূড়ান্তভাবে আমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য মনোনীত *শারী'য়াহ্*'র অনুসরণ করাকে নিষিদ্ধ করেছে, যদিওবা তা *কুর'আনে*, *সুন্নাহ্*'তে কিংবা উভয়টিতে এসেছে। আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করবে, কখনও তা তার থেকে কবুল করা হবে না"* (আল ইমরান: ৮৫); আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেছেন: *"নিঃসন্দেহে ইসলামই হলো আল্লাহ্'র কাছে গ্রহনযোগ্য একমাত্র দ্বীন"* (আল ইমরান: ১৯)। সুতরাং, যেহেতু এমন একটি *শারী'য়াহ্* দলিল বিদ্যমান যাতে বলা আছে যে, ইসলামের *দ্বীন* ব্যতিরেকে যেকেউ অন্য *দ্বীন* গ্রহণ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, সেহেতু কিভাবে মুসলিমদেরকে তা অনুসরণ করতে বলা হবে? আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি সত্যসহ এ কিতাব যা পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের স্বীকৃতিদানকারী এবং তাতে যা আছে তার সংরক্ষনকারী"* (মায়িদাহ: ৪৮); এই আয়াতে কুর'আন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সংরক্ষনকারী অর্থ এটা নয় যে এই কুর'আন সেগুলোর স্বীকৃতিদানকারী, যেহেতু এই আয়াতে *"স্বীকৃতিদান"* শব্দটিও এসেছে; বরং এর অর্থ হচ্ছে কুর'আনের শ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ কুর'আন সেগুলোকে রদ করে দিয়েছে। এছাড়াও সাহাবাদের *ইজ্মা* রয়েছে যে, ইসলামের *শারী'য়াহ্* পূর্ববর্তী সকল *শারী'য়াহ্*কে রদ করে দিয়েছে। আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন: *"যখন ইয়াকুবের মৃত্যু উপস্থিত হলো, তোমরা কি তখন সেখানে ছিলে? সে যখন পুত্রদের জিজ্ঞেস করল: আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে? তখন তারা বলল: আমরা আপনার ইলাহ্-এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহ্-এর ইবাদত করব। তিনি তো একমাত্র ইলাহ্, আমরা সবাই তার কাছে আত্মসমর্পণকারী। তারা ছিল এক উম্মত্ যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে তা তাদের, আর তোমরা যা কর তা তোমাদের। তারা যা করত সে ব্যাপারে তোমাদের কোন প্রশ্ন করা হবে না"* (সূরা বাকারা : ১৩৩-১৩৪)। অতএব, আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী নবীগণ কি করেছেন সে বিষয়ে তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন না, এবং যেহেতু আমরা তাদের কাজের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হব না সেহেতু তাদের *শারী'য়াহ্* বহন ও তদানুযায়ী কাজ করার বিষয়ে জবাবদিহিতার সম্মুখিন হব না। যে বিষয়ে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না সে বিষয়ে আমাদেরকে কোন আদেশ দেয়া হয়নি এবং সেটা আমাদের জন্য অপ্রয়োজনীয়। এছাড়াও, যাবের হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: *"আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি, প্রত্যেক নবীকে তাদের নিজস্ব কওমের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে প্রেরণ করা হয়েছিল, এবং আমাকে লাল-কালো (অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতি) সকলের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে"* (মুসলিম); এবং আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: *"আমাকে অন্যান্য নবীদের উপর ছয়টি বিষয়ে পছন্দনীয় করা হয়েছে"* (মুসলিম); এবং তখন তিনি সেগুলো উল্লেখ করেন এবং সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে: *"এবং আমাকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে"*। অতএব, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন যে তাঁর (সা.) পূর্বের সকল নবীকে নির্দিষ্টভাবে তাঁদের নিজস্ব কওমের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল, সুতরাং তাদেরকে তাদের কওম ব্যতিত অন্য কারও জন্য প্রেরণ করা হয়নি এবং তারা নিজেদের নবী ব্যতিত অন্য নবীর *শারী'য়াহ্* মেনে চলতে বাধ্য ছিল না। অতএব এটা নিশ্চিত যে, অন্যান্য নবীগণের কাউকেই আমাদের জন্য প্রেরণ করা হয়নি এবং তাঁদের *শারী'য়াহ্* আমাদের *শারী'য়াহ্* হতে পারে না। এটা কুর'আনে পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে সমর্থিত *"আর আমি তাঁদের কাছে পাঠিয়েছিলাম তাঁদের ভাই হুদকে"*, *"এবং সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহ্কে পাঠিয়েছিলাম"*, *"আর মাদ্ইয়ান বাসীদের কাছে আমি তাদের ভাই শো'য়ায়েবকে পাঠিয়েছিলাম"* (সূরা হুদ : ৫০, ৬১, ৮৪)।

উপরের সকল আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার যে, আমাদের পূর্ববর্তীগণের *শারী'য়াহ্* তিনটি কারনে আমাদের জন্য প্রযোজ্য *শারী'য়াহ্* হিসেবে বিবেচিত হবে না। প্রথমটি হচ্ছে: দলিল হিসেবে যে প্রমানসমূহ রয়েছে সেগুলো শুধুমাত্র *তাওহীদের* ভিত্তিকেই নির্দেশ করে এবং নবীদের সকল *শারী'য়াহ্* যে একই তা নির্দেশ করে না। দ্বিতীয়ত: *শারী'য়াহ্* উৎসে ইসলামের *শারী'য়াহ্* ব্যতিত অন্য *শারী'য়াহ্* অনুসরনের উপর নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ রয়েছে। এবং তৃতীয়ত: প্রত্যেক নবীকে তাঁর নিজস্ব কওমের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমরা তাঁদের কওমের অন্তভুক্ত নই, অতএব তাঁরা আমাদের জন্য প্রেরিত নবী নন। তাই তাঁদের *শারী'য়াহ্* আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে আসেনি এবং আমরা সেগুলো মানতে বাধ্য নই। অতএব, আমাদের পূর্ববর্তীগণের *শারী'য়াহ্* আমাদের জন্য *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে না।

এই আলোচনা তাদের জন্য যারা কুর'আনের আয়াতকে এই বিষয়ে *শারী'য়াহ্* প্রমান হিসেবে পেশ করে থাকে। যারা মনে করে যে, আল্লাহ্'র (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) পক্ষ থেকে রাসুল (সা.) আমাদেরকে যা অবহিত করেছেন তার সবকিছু আমাদের মেনে চলতে হবে; তাদেরকে বলা যায় -

এটা কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে সত্য যেক্ষেত্রে তিনি (সা.) আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে তা মেনে চলা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং সেটা হচ্ছে *শারী'য়াহ্* যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের নিকট বহন করে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তাদের এই অনুমান সেক্ষেত্রে সঠিক নয় যে, তিনি (সা.) আমাদেরকে যে নির্দেশ দেননি সেটাও পালন করতে হবে। অতএব, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্'র (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) কাছ থেকে আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনাসম্বলিত ওহী বহন করেছেন, কিন্তু তিনি সেসব আমাদের জন্য উদাহরণ হিসেবে এবং তিরস্কার হিসেবে অবহিত করেছেন, এবং তাদের *শারী'য়াহ্* মেনে চলার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেননি। অতএব, নবীদের কাহিনীসমূহ ও তাঁদের ঘটনাসমূহ এবং তাঁদের জাতিদের বিষয়াদি আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে; এবং তাদের পরিস্থিতিসমূহ ও তারা কি ধরনের নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতো তাও আমাদের কাছে পরিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়াও, এসবকিছুই শুধুমাত্র উদাহরণ ও বিশেষভাবে উপদেশ হিসেবে আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা তাদের *শারী'য়াহ্* দ্বারা আমাদেরকে আদিষ্ট করার জন্য বর্ণনা করা হয়নি।

এই কাহিনী ও সংবাদগুলোর (*আখ্বার*) ক্ষেত্রে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো বিশেষভাবে উপদেশ ও শিক্ষা হিসেবে এসেছে এবং এটার কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই, এবং জাতিসমূহের অবস্থা ও বিধান হিসেবে তারা যা অনুসরণ করত সেগুলো তাদের সম্পর্কে প্রতিবেদন হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে এবং আমাদের জন্য সেগুলো মেনে চলার বাধ্যবাধকতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। সেগুলো শুধুমাত্র এমন কাহিনী যেগুলোতে পূর্ববর্তী নবীগণের ও জাতিসমূহের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে।

এসবকিছু ছাড়াও, এসব আইনের অনেকগুলোই ইসলামী *শারী'য়াহ্*'র সাথে সাংঘর্ষিক, অতএব যদি এগুলো আমাদের জন্য প্রযোজ্য হত তবে আমাদের উপর দুটি ভিন্ন *শারী'য়াহ্* মানার বাধ্যবাধকতা চলে আসত যা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। সুলায়মান (আ.)-এর উপর নাযিলকৃত *শারী'য়াহ্* হতে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"সুলায়মান পাখিদের খোঁজ-খবর নিলেন এবং বল্লেন: ব্যাপার কি! হুদহুদ পাখিকে দেখছি না কেন? সে পালাল নাকি? আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দেব, অথবা তাকে যবেহ্ করব, যদিনা সে আমার কাছে কোন উপযুক্ত কারণ উপস্থাপন করে"* (নামল : ২০-২১)। যদিওবা পাখিটি অবাধ্য ছিল তথাপি এটাকে শাস্তি দেয়ার নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই, এছাড়াও যেকোন পশুকে শাস্তি দেয়ার অনুমোদন না থাকার বিষয়েও কোন মতপার্থক্য নেই এবং এ বিষয়ে শারী'য়াহ্ দলিলও এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: *"পশু কর্তৃক যেকোন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে যুবার"* (আবু হুরায়রা (রা.) হতে উভয় কর্তৃক ঐক্যমত্য রয়েছে); এটা সম্পর্কে আল মুহিত অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে: *"যুবার হচ্ছে মেঘের মতো যেটি ভীরুতাকে ধ্বংস করেছিল এবং যুবার হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতি ও অচল"*। এজন্যই পশুপাখি দ্বারা কোন ক্ষয়ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণ নেই (অর্থাৎ, পশুপাখির মালিক দায়ী হবে না)।

মুসা (আ.)-এর উপর নাযিলকৃত *শারী'য়াহ্*তে আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"আর আমি ইহুদীদের জন্য সব নখরযুক্ত পশু হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, তবে যে চর্বি সেগুলোর পিঠের, অথবা অন্ত্রের, কিংবা হাড়ের সাথে মিলিত থাকে তা ছাড়া"* (আন'আম: ১৪৬); এবং ইসলামের *শারী'য়াহ্*তে এগুলোর সবকিছুই মুসলিমদের জন্য অনুমোদিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য অনুমোদিত"* (সূরা মায়িদাহ্: ৫); এবং যেহেতু এই চর্বি আমাদের খাদ্য থেকে এসেছে সেজন্যই এটা তাদের জন্য অনুমোদিত। কুর'আনে উম্মে মারিয়ামের কথা: *"আমার গর্ভে যা আছে আমি তা সবকিছু থেকে মুক্ত রেখে তোমার জন্য মানত করলাম"* (আল-ইমরান: ৩৫)- এগুলো যাকারিয়া (আ.)-এর সময়কার মানুষদের জন্য নাযিলকৃত *শারী'য়াহ্*'র অংশ এবং এটা মৌলিকভাবে ইসলামে অনুমোদিত নয়। *কুর'আনে* আসা শব্দসমূহ: *"সব খাদ্যই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল, সেগুলো ব্যতিত যা নিজের জন্য হারাম করেছিল"* (আলে-ইমরান: ৯৩), আর এটি ইয়াকুব (আ.)- এর উপর নাযিলকৃত *শারী'য়াহ্*'র অংশ এবং ইসলামে আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) যা অনুমোদিত করেছেন সেটা থেকে বিরত থাকা কারও জন্য অনুমোদিত নয়; তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন আপনি তা হারাম করেছেন কেন?"* (তাহ্রীম : ১)। গুহাবাসীদের সময়কার কিতাবধারীদের *শারী'য়াহ্*'র মধ্যে আছে যে: *"যখন তারা নিজেদের মধ্যে তাদের ব্যাপারে বিতর্ক করছিল তখন তারা বলল: "আমরা তাদের উপর সৌধ নির্মাণ করব"* (সূরা কাহফ : ২১), এবং

এটা ইসলামে নিষিদ্ধ; রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: *"সত্যই, কোন সমাজের একজন ভাল মানুষের মৃত্যু হওয়ার পরে যদি কেউ তার কবরের উপরে প্রার্থনা করার জায়গা তৈরী করে তবে তারা সৃষ্টির সবচেয়ে মন্দ লোক"* (উভয়ের ঐক্যমত্য রয়েছে)।

মুসা (আ.)-এর শারী'য়াহ্'র কিছু অংশ: *"আমি তাদের জন্য ফরয করে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং অনুরূপভাবে জখমের বদলে জখম"* (মায়িদাহ: ৪৫); আমরা এখান থেকে হুকুম গ্রহন করি না, কারণ আমাদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হয়নি এবং আমাদের জন্য এটা প্রযোজ্য নয়, বরং শুধুমাত্র অন্যদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইসলাম শুধুমাত্র আমাদেরকে এসব ক্ষেত্রে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেয়াকে বাধ্যতামূলক করেছে যা আল্লাহ্'র (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বানীতে আসা শব্দে উল্লেখ রয়েছে: *"কাজেই যে কেউ তোমাদের উপর জবরদস্তি করবে তোমরাও তাদের উপর জবরদস্তি করবে, যেমন জবরদস্তি তারা তোমাদের উপর করেছে"* (বাকারা: ১৯৪), তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহন কর তবে সে পরিমানই গ্রহন করবে যে পরিমান তোমরা নিপীড়িত হয়েছ"* (নাহল: ১২৬), এবং তিনি আরও বলেছেন: *"আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দ"* (শুরা: ৪০), এছাড়াও, কিসাস্ সম্পর্কে তাঁর (সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা) নাযিলকৃত এই আয়াতটি: *"এবং অনুরূপভাবে যখমের বদলে যখম"* (মায়িদাহ: ৪৫) ইসলামে অনুমোদিত *কিসাস্*-এর (ক্ষতিপূরণ) সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ ইসলামে অনুমোদিত *কিসাস্* হিসেবে জরিমানা গ্রহনের বিধান রয়েছে এবং তাওরাতে জরিমানা গ্রহনের কোন বিধান নেই। বরং, জরিমানা হচ্ছে শুধুমাত্র ইসলামী আইন এবং এক্ষেত্রে জরিমানা হচ্ছে রক্তপন; সুতরাং, জীবননাশের বা হত্যার বদলা হিসেবে নেয়া রক্তপন হচ্ছে জরিমানা। একই রকমভাবে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ ও তাদের জাতিসমূহের বিভিন্ন কাহিনীতে *কিসাস্* সম্পর্কিত বিভিন্ন হুকুমের ক্ষেত্রে তাদের পরিস্থিতি এবং বিধিবিধান হতে তারা কি অনুসরণ করত তার বর্ণনা রয়েছে যার সাথে ইসলামের বিধানের বৈপরিত্য বিদ্যমান; সুতরাং, আমাদের জন্য সেসব হুকুম কিভাবে প্রযোজ্য হতে পারে?

এটা বলা যাবে না যে এই হুকুমগুলো ইসলামী *শারী'য়াহ্* দ্বারা রহিত করা হয়েছে, কারণ এগুলো কোন বিধি-নিষেধ ব্যতিরেকেই বর্ণনা করা হয়েছে এবং আমাদের কাছে যে আইনসমূহ এসেছে সেগুলো আমাদের পূর্ববর্তীগণের আইনসমূহকে রহিতকারী হিসেবে আসেনি। বরং, সেগুলো আমাদের জন্য *শারী'য়াহ্* হিসেবে এসেছে এবং উভয় বিধানের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। তদনুসারে, এক্ষেত্রে রহিতকরণের বিষয়টি পাওয়া যায়না এবং এই দাবির স্বপক্ষে কোন দলিল নেই। কারণ, রহিতকরণের অর্থ হচ্ছে পরবর্তী *শারী'য়াহ্* দলিলের মাধ্যমে পূর্ববর্তী *শারী'য়াহ্* দলিল হতে প্রাপ্ত হুকুম বাতিলের আদেশ, উদাহরণ হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বক্তব্য: *"আমি তোমাদেরকে কবরসমূহ জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন থেকে জিয়ারত কর"* (বুরাইদাহ্ হতে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত) এবং ইবনে আব্বাস হতে আল-রাবী' তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন: *"আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তোমরা জিয়ারত কর"*, অতএব পরবর্তী শারী'য়াহ্ দলিলের মাধ্যমে পূর্ববর্তী হুকুম বাতিল এবং প্রত্যাহার করা হচ্ছে রহিতকরণ। অতএব, রহিকরণ হতে হলে রহিতকরনের হুকুম আসার আগে এমন একটি হুকুম থাকতে হবে যেটাকে রহিত করা হবে, এবং রহিতকরনের দলিলে এরকম ইঙ্গিত থাকতে হবে যে এটির দ্বারা সেই হুকুমকে রহিত করা হয়েছে এবং এটা ব্যতিত অন্য কোন কিছুই রহিতকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। দুটি হুকুমের মধ্যে পার্থক্য কিংবা অসঙ্গতি থাকার অর্থ এটা নয় যে, কোন একটি অপরটিকে রদ করার জন্য এসেছে, বরং রহিতকরনের দলিলে ইঙ্গিত বা নির্দেশনা থাকতে হবে যে এটা কোন একটি সুনির্দিষ্ট হুকুমকে রহিত করছে। তদানুসারে পূর্ববর্তী *শারা'ঈ*গুলো হতে বিবৃত হুকুমগুলোর মধ্য হতে যেগুলোর সাথে ইসলামের পার্থক্য বা অসঙ্গতি রয়েছে সেগুলোকে ইসলামের বিধান দ্বারা রহিত করা হয়নি, কারণ এ ধরনের কোন ইঙ্গিত বা নির্দেশনা নেই। এছাড়াও, আইনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী *শারী'য়াহ্*'র বিধান এবং ইসলামী বিধানের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং, পূর্ববতী *শারা'ঈ* হুকুমগুলোকে রহিত করার জন্য আসা কোন সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা এগুলোকে রহিত করা হয়নি, বরং এগুলো ইসলামের *শারী'য়াহ্* দ্বারা পূর্ববর্তী *শারা'ঈসমূহ* রহিত হয়ে যাওয়ার কারনে সেসব *শারা'ঈ* হুকুমগুলোও রহিত হয়ে গেছে। এর মাধ্যমে এটা পরিষ্কার হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যা নিয়ে এসেছেন তার সবকিছুই আমাদের উপর প্রযোজ্য হবে এবং আমরা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব- এ ধরনের অনুমান যথার্থ নয়, কারণ আমরা ইসলামের বিধান হিসেবে তাঁর (সা.) মাধ্যমে যা এসেছে তাই মেনে চলব ও সেটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব, এবং পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের কাহিনী ও তাদের বর্ণনাসমূহ থেকে যা তিনি (সা.) আমাদেরকে অবহিত করেছেন তা এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনাসমূহ ও তাদের দ্বারা অনুসৃত বিধানাসমূহ থেকে যা তিনি (সা.) আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন তাও আমাদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। তদনুসারে, এটা

স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়েছে যে আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর নাযিলকৃত বিধান আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয় এবং এগুলো বাতিল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার বিষয়টি ইসলামী দলিলেও সুস্পষ্ট।

যাহোক, আমাদের পূর্ববর্তীগণের *শারী'য়াহ্* হতে আসা বিধানসমূহের ক্ষেত্রে এমন কোন *শারী'য়াহ্* দলিল যদি পাওয়া যায় যা নির্দেশ করে যে সেগুলো আমাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে, তবে সেক্ষেত্রে সেই হুকুম *কুর'আন* বা *সুন্নাহ্*'তে পাওয়া, এবং এর সাথে সাথে একটি *শারী'য়াহ্* দলিলও যা নির্দেশ করে যে, আমাদের *শারী'য়াহ্*'র মধ্যেও সেটা দ্বারা আমাদেরকে আদিষ্ট করা হয়েছে এবং আমাদের জন্য আইনপ্রণেতার (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বিধানও যা নির্দেশ করে যে সেটা আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং তখন সেটার ভিত্তিতে কাজ করাও বাধ্যতামূলক। যাহোক, এটা এজন্য নয় যে সেটা আমাদের পূর্ববর্তীগণের *শারী'য়াহ্* বরং একই বিধানে নির্দেশ থাকার কারণে যে তা আমাদের জন্যও প্রযোজ্য; ভিন্ন শব্দে বলা যায় যে, যেহেতু আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) সেটা দ্বারা আমাদেরকে আদিষ্ট করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন যে তাঁর (সা.) সাথে আসা *শারী'য়াহ্* হতে এটা এসেছে; অর্থাৎ ইসলামের বিধিবিধান হতে এটা এসেছে।
কুর'আন ও *সুন্নাহ্*'তে আসা বিধানসমূহের প্রতি এবং পূর্ববর্তী *শারা'ঈ*গুলোতে আসা বিধানগুলোর প্রতি মনোযোগে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে এমন কোন দলিল যেটাতে এরূপ নির্দেশনা থাকে যে সেগুলো আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ও আমাদের *শারী'য়াহ্* থেকে এসেছে যে তা তিনটি পরিস্থিতিতে পাওয়া যায়:
প্রথমত: যখন আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে কুর'আনের আয়াতের মাধ্যমে কোন হুকুম আসে, যেমন: *কান্য* (মজুতকৃত সম্পদ) সম্পর্কিত আয়াতে আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"হে মুমিনগণ! তাদের পন্ডিত ও সংসারবিরাগী যাজকদের মধ্যে অনেকে মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে এবং আল্লাহ্'র পথে বাধা সৃষ্টি করে। এবং যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহ্'র পথে তা ব্যয় করে না তাদেরকে আপনি যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সংবাদ জানিয়ে দিন"* (সূরা তওবা: ৩৪)। আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে এই আয়াতটি নাযিল করেছেন। সুতরাং, এর মধ্যে যেটাই উল্লেখ করা হয়েছে তা আমাদের জন্য শারী'য়াহ্। তদনুসারে, *কান্য* আমাদের *শারী'য়াহ্*'তে নিষিদ্ধ, যদিওবা এই আয়াতের কিছু অংশে ইহুদী আইনজ্ঞ ও সন্নাসীদের পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: হুকুমটি নিয়ে আসা আয়াতটি একটি শব্দ সহকারে এসেছে যেটা সার্বজনীনতাকে নির্দেশ করে, যেমন: আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) যা নাযিল করেছেন সেটা ব্যতিত অন্য কিছু দ্বারা শাসন করার বিষয়টি যে আয়াতসমূহে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"যে কেহ আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী বিধান দেয় না তারাই কাফির"* (সূরা মায়িদাহ্: ৪৪)। সুতরাং *"যে কেহ"* শব্দটি সার্বজনীনতাকে নির্দেশ করে এবং এর অর্থ হচ্ছে যে, এটার দ্বারা আমাদেরকে বোঝানো হচ্ছে এবং আমাদের জন্যও এটা প্রযোজ্য। একইভাবে আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"আর যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী বিধান দেয় না তারাই যালিম"* (সূরা মায়িদাহ্: ৪৫), এবং একই রকমভাবে: *"এবং আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী যারা বিধান দেয় না তারা ফাসেক"* (সূরা মায়িদাহ্: ৪৭)।

তৃতীয়ত: যদি আয়াতটি এমন কিছু দ্বারা সমাপ্ত হয় যা আয়াতটিতে আসা হুকমটির প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, যেমন: কারুনের ঘটনাসহ *কিসাস্*-এর আয়াত, যেখানে আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"কারুন তো মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, কিন্তু সে তাদের সামনে দম্ভ করত। আমি তাকে এত অধিক পরিমান ধন ভান্ডার দিয়েছিলাম যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল"*, এরপরে এ বিষয়ে আল্লাহ্'র (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বানী এভাবে শেষ হয়: *"তোমরা কি জান না যে অবিশ্বাসীরা কখনও সফলকাম হতে পারবে না"* (সূরা কাসাস: ৭৬-৮২)। এই আয়াতটির পরে আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন: *"এটা আখেরাতের সেই আবাস, যা আমি তাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছি যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম তো মোত্তাকীদের জন্য"* (সূরা কাসাস: ৮৩), এবং এজন্যই এই আয়াতগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে। যখন উপরোক্ত আয়াতে এটা বলা হয়েছে যে, *"যারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে চায় না"*-তখন এর সাথে আসা হুকুমের প্রতি মনোযোগ আকর্ষিত হয় এবং এই হুকুমগুলো যদিওবা ছিল দুনিয়াতে আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের আকাঙ্খাকারী কারুনের প্রতি, তথাপি এতে নির্দেশনা পাওয়া যায় যে এসব হুকুম আমাদের উপরও প্রযোজ্য হবে।

এই তিনটি পরিস্থিতিতে, পূর্ববর্তীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হুকুমসম্বলিত আয়াতগুলো ইসলামী *শারী'য়াহ্*'র হুকুম হিসেবেও বিবেচিত হবে। কারণ এগুলোতে এরূপ নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, এগুলো আমাদের জন্যও প্রযোজ্য এবং আমরা এগুলোকে ইসলামী *শারী'য়াহ্*'র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিধান হিসেবে গ্রহন করি এবং আমরা এগুলোকে আমাদের পূর্ববর্তীগণের *শারী'য়াহ্* বিধান হিসেবে গ্রহন করি না, কারণ আমাদের পূর্ববর্তীগণের *শারী'য়াহ্* আমাদের জন্য *শারী'য়াহ্* নয়।

যেসব ব্যক্তি বলে যে, *ইস্‌তিহ্‌সান* (আইনী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার প্রয়োগ) *শারী'য়াহ্* দলিল হতে এসেছে, তারা তাদের দাবির সমর্থনে *শারী'য়াহ্* হতে একটি দলিলও পেশ করতে পারেনি, এমনকি কোন দুর্বল দলিলও নয়। যারা *ইস্‌তিহ্‌সান*কে *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে গ্রহন করে তারা এর ব্যাখ্যা হিসেবে বলে যে: এটা এমন একটি দলিল যেটা তখনই উদ্ভব হয় যখন এটাকে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতির কারণে কোন *মুজ্‌তাহিদ* এটাকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করতে অপারগ হন। এটাও ব্যাখ্যা করা হয় যে, বক্তব্যের পূর্ণাঙ্গতা ব্যতিরেকে ইজতিহাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হতে কোন একটি বৈশিষ্ট্যকে অন্য একটি অধিকতর শক্তিশালী বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিত্যাগ করা হয় যা প্রাথমিক পর্যায়ে অপ্রত্যাশিত বিষয়ের মতো মনে হতে পারে। একইভাবে এটাও ব্যাখ্যা করা হয় যে, এটি এমন একটি বিষয় যা তুলনামূলকভাবে অধিকতর শক্তিশালী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আরেকটি হুকুমের জন্য কোন একটি হুকুম পরিত্যাগ করাকে প্রয়োজনীয় করে তোলে। এছাড়াও এটা বলা হয় যে, অন্য কোন তুলনামূলক শক্তিশালী বিষয়ের জন্য কোন একটি বিষয়কে বর্জন করা হয়েছে।

ইস্‌তিহ্‌সান দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত: প্রথমটি হচ্ছে *ইস্‌তিহ্‌সান ক্বিয়াসী* এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে *প্রয়োজন সাপেক্ষে ইস্‌তিহ্‌সান*। স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হওয়া একটি *ক্বিয়াস* থেকে আসা হুকুমকে পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে *ইস্‌তিহ্‌সান ক্বিয়াসী* করা হয়ে থাকে যা আরেকটি *ক্বিয়াসে*'র মাধ্যমে ভিন্ন একটি হুকুমকে সামনে নিয়ে আসে এবং এই ভিন্ন হুকুমটি অধিকতর সুক্ষ্ম ও গোপন হলেও অধিকতর সন্তোষজনক দৃষ্টিভঙ্গি ও অধিকতর সঠিক উৎপত্তি সহকারে শক্তিশালী প্রমান বহন করে। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে: যদি একজন ব্যক্তি একটি চুক্তির অধীনে দুজন ব্যক্তির কাছ থেকে ঋন হিসেবে বাকিতে একটি গাড়ি ক্রয় করে। অত:পর দুজনের মধ্য হতে একজন অংশীদারকে ঋণের অংশবিশেষ পরিশোধ করা হয়। যাহোক, এটি এককভাবে তার নেয়ার অধিকার ছিল না; বরং অপর অংশীদারেরও সেই পরিশোধিত অর্থের অংশ দাবি করার অধিকার রয়েছে, কারণ প্রথম অংশীদার এই একক বিক্রয় চুক্তির আওতাধীন মিলিত বিক্রয়মূল্য হতে পরিশোধিত অর্থ গ্রহণ করেছে। অধিকন্তু, উভয় অংশীদারের মধ্যকার সম্মিলিত বিক্রয়চুক্তির বিক্রয়মূল্য হতে যদি কোন একজন অংশীদার কোন অর্থ গ্রহণ করে তবে তা উভয় অংশীদারের উপরেই বর্তাবে; ভিন্ন শব্দে বলা যায় যে, এটা অংশীদার চুক্তির অংশ এবং কোন একজন অংশীদারের জন্য এককভাবে পরিশোধিত অর্থ গ্রহণ করা বাঞ্চনীয় নয়। সুতরাং, বিক্রয়মূল্যের যে পরিমাণ অর্থই নেয়া হোক না কেন তা বাতিল হয়ে যাবে, কারণ এটি থেকে দ্বিতীয় অংশীদার তার প্রাপ্ত অংশ নেয়ার পূর্বেই প্রথম অংশীদার নিজের দখলে নিয়ে নিয়েছে। এক্ষেত্রে *ক্বিয়াসে'র* মাধ্যমে প্রাপ্ত হুকুম হচ্ছে যে, পরিশোধিত অর্থ দুজনের সামগ্রিক পাওনা থেকে বা, ভিন্ন অর্থে অংশীদার চুক্তির মোট যোগফল হতে বাদ যাবে। যাহোক, এক্ষেত্রে *ইস্‌তিহ্‌সানের* মাধ্যমে আসা হুকুম অনুযায়ী- যে অংশীদার পরিশোধিত অর্থ একাই গ্রহণ করেছে শুধুমাত্র তার কাছ থেকেই ক্ষতি হয়ে যাওয়া অর্থ আদায় করা হবে এবং *ইস্‌তিহ্‌সান* অনুযায়ী দ্বিতীয় অংশীদারের উপর কোন ক্ষতি বর্তাবে না, কারণ মৌলিকভাবে সে গ্রহণকারী অংশীদার হতে আলাদা নয়; বরং, সে গ্রহণকারী অংশীদার যা গ্রহণ করেছে তা ছেড়ে দিতে পারে এবং আলাদাভাবে দেনাদারের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে পারে। অপর উদাহরণসমূহও একই পদ্ধতি অবলম্বন করে। এটাই হচ্ছে *ইস্‌তিহ্‌সান ক্বিয়াসী*।

প্রয়োজন সাপেক্ষে *ইস্‌তিহ্‌সান*-এর ক্ষেত্রে: এটা *ক্বিয়াসে'র* নিয়মের সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ এতে কোন প্রয়োজন পূরনের জন্য কিংবা কষ্ট বা দূর্ভোগ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে আপতিত প্রয়োজন বা প্রয়োজনীয় সুবিধার বিষয়টি আমলে নেয়া হয়। এটা তখনি উদ্ভব হয় যখন *ক্বিয়াসে'র* মাধ্যমে আসা হুকুম কষ্টের দিকে নিয়ে যায়, কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে এবং তখনই *ইসতিহ্‌সানের* মাধ্যমে আরেকটি হুকুম নিয়ে এসে *ক্বিয়াসে'র* হুকুমকে পরিত্যাগ করা হয়, যার ফলে কষ্টের পরিসমাপ্তি ঘটে ও সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে সেই কর্মচারীর উদাহরণের মতো যাকে কোন সম্পত্তি দেখাশোনা করার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে সেটি *আমানাত* (বিশ্বাস) হিসেবে বিবেচিত হবে; সুতরাং, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার দায়িত্বে থাকা সম্পদের ব্যাপারে অবহেলা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত যদি সম্পদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়

তবে এই ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার তাকে বহন করতে হবে না। অতএব, যদি কেউ তার বাড়িতে অন্য কারও জন্য একমাসের মেয়াদে কাপড় সেলাইয়ের কাজে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয় তবে সে ব্যক্তিগত কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হবে। এরপর, যদি কর্মচারীর দায়িত্বে থাকা অবস্থায় কাপড়ের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং এক্ষেত্রে কর্মচারীর কোন অবহেলা না থাকে তবে তাকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ তাকে বিশ্বাস করেন তার দায়িত্বে কাপড় দেয়া হয়েছিল। এছাড়াও, যদি কেউ তার দোকানে অপরের জন্য কাপড় সেলাইয়ের কাজে কাউকে নিয়োগ দেয় এবং সেই কর্মচারী যদি সকলের জন্য কাপড় সেলাই করে তবে সে একজন সাধারণ কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হবে। সুতরাং, যদি কর্মচারীর দায়িত্বে থাকা অবস্থায় কাপড়ের ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং এক্ষত্রে তার কোন অবহেলা না থাকে তবে তাকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ পূর্বের মতো একই পদ্ধতিতে তাকে বিশ্বাস করে তার উপর কাপড়ের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল। যাহোক, *ইস্‌তিহ্‌সান* অনুসারে ব্যক্তিগত কর্মচারীর উপর কোন ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়ভার আরোপ করা হবে না, কিন্তু সাধারণ কর্মচারীর উপর ক্ষতিপূরণ ধার্য করার বিষয়টি প্রয়োজন হবে, যাতে করে সে সাধ্যের অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ না করে যার ফলে মানুষের সম্পদ সে নষ্ট করে ফেলতে পারে।

এটা হচ্ছে *ইস্‌তিহ্‌সান* এবং এর দলিলের সারাংশ। এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো দলিল নয়; বরং এগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র যৌক্তিক পরিত্যাগ যা *কুর'আন*, কিংবা *সুন্নাহ্* হতে আসেনি। *ইস্‌তিহ্‌সান* যে *শারী'য়াহ্* দলিল হতে এসেছে সেটা চুড়ান্তভাবে প্রমানিত হওয়া দূরে থাক, এমনকি অনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হিসেবে বিবেচিত হওয়ার পর্যায়েও পৌঁছুতে পারেনি। এটি একটি দৃষ্টিকোন্ হতে বলা হয়েছে এবং আরেকটি দৃষ্টিকোণ হতে বলা যায় যে, যৌক্তিক পরিত্যাগ হতে যেটাই আসুক না কেন সেটা বাতিল বলে গণ্য হবে।

ইস্‌তিহ্‌সানের ব্যাখ্যা হিসেবে যা কিছুই বলা হোক না কেন তার সবই অবৈধ। প্রথম ব্যাখ্যা, যেখানে বলা হয় যে *মুজ্‌তাহিদের* মনের মধ্যে দলিল অনুভূত হয় এবং সে জানে না যে সেটা কি; যদিওবা, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দলিল অজানা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটিকে দলিল হিসেবে গণ্য করার অনুমোদন নেই। কারণ দলিলটিকে পরিষ্কার ও দৃশ্যমান করে তোলার অক্ষমতাই প্রমান করে যে এটা *মুজ্‌তাহিদের* কাছে সুস্পষ্ট নয় এবং এটার বিষয়ে তার জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে; সুতরাং, এটাকে *শারী'য়াহ্* দলিলের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা সঠিক হবে না। অন্যান্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, সেগুলোর সব অর্থ একই, অর্থাৎ অন্য আরেকটি অধিকতর শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বর্তমানের কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে একই বিষয় সমূহ পরিত্যাগ করা, ভিন্নভাবে বলা যায় যে অধিকতর শক্তিশালী দলিলের জন্য *ক্বিয়াসে'র* মাধ্যমে আসা হুকুম পরিত্যাগ করা। যদি এই ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে "অধিকতর শক্তিশালী দলিলের" মাধ্যমে *কুর'আন* বা *সুন্নাহ্'র* কোন দলিলকে বোঝানো হতো তবে এটি *ইস্‌তিহ্‌সান* হতো না, বরং এটি দলিলের অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হতো। সুতরাং, এটা *কুর'আন* ও *সুন্নাহ্* হতে উৎসরিত দলিল হতে উদ্ভুত হিসেবে বিবেচিত হতো এবং *ইস্‌তিহ্‌সানের* মাধ্যমে উদ্ভুত হতো না। যদি "অধিকতর শক্তিশালী দলিল" বলতে মানুষের মনকে বোঝানো হয়ে থাকে যার মাধ্যমে এটাকে কল্যাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটাই এর অন্তর্নিহিত অর্থ হয় তবে তা অবৈধ। কারণ *শারী'য়াহ্ ইল্লাহ্'র* ভিত্তিতে *ক্বিয়াস* করা হয় যা দলিল দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং উদ্ভুত হুকুমটি আমাদের জন্য আইনপ্রনেতার (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) হুকুম হিসেবে বিবেচিত হয়। মন এবং কল্যাণ কোন *শারী'য়াহ্* দলিল নয় এবং দলিল হতে আসা শক্তিশালী কোন *ইল্লাহ্'*ও নয়; বরং *শারী'য়াহ্* দলিলের (অর্থাৎ, যা ওহী হিসেবে নাযিল হয়েছে) সাথে মন এবং কল্যাণের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। এই কারনে *ক্বিয়াসে'র* মাধ্যমে আসা হুকুম পরিত্যাগ করা সম্পুর্নরুপে অবৈধ।

উপরোক্ত আলোচনাটি ছিল *ইস্‌তিহ্‌সানের* ব্যাখ্যা বিষয়ক, আর *ইস্‌তিহ্‌সানের* শ্রেণীর ক্ষেত্রে বলা যায়: *ইস্‌তিহ্‌সান ক্বিয়াসী* বাতিল হওয়ার বিষয়টি দ্বিতীয় ব্যাখ্যার অসারতা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যাতে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি বিষয়কে পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছিল। এছাড়াও, এটাকে যে তারা গোপন *ক্বিয়াস* হিসেবে বিবেচনা করে যা অবৈধ, কারণ *ক্বিয়াসে'র* সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই; বরং, এটা শুধুমাত্র সুবিধার ভিত্তিতে যুক্তি প্রয়োগ (কল্যাণ/সুবিধাকে *ইল্লাহ্* বানিয়ে)। সম্মিলিত বিক্রয় চুক্তির মূল্যের উদাহরনের ক্ষেত্রে: যেহেতু একটিমাত্র চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়েছিল সেহেতু এতে হুকুমের মধ্যে পার্থক্য করা সঠিক নয়, অর্থাৎ দুজনের মধ্য হতে একজন অংশীদারের গ্রহণ করার কারনে সম্পদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা অংশীদারিত্ব সম্পদের ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, দুজনের মধ্য হতে একজন অংশীদার যে অর্থ গ্রহণ করেছে তা অংশীদারিত্বের দলিলের সম্পদ হতেই নেয়া হয়েছে। যেহেতু, সম্পদ হিসেবে সেটি বিক্রিত গাড়ি কিংবা তার মূল্য যেটাই হোক না কেন তা অংশীদারিত্বের সম্পদ এবং কোন

একজন অংশীদারের একক সম্পদ নয়, সেহেতু এর ক্ষতির অর্থ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ক্ষতি। একইভাবে এটা আত্মসাৎ করার মানে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ আত্মসাৎ করা। সুতরাং, এই কল্যাণ/সুবিধার (*মাস্‌লাহি*) ভিত্তিতে হুকুম পরিত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই এবং এটি *শারী'য়াহ্*'র সাথে সাংঘর্ষিক।

প্রয়োজন সাপেক্ষে *ইস্‌তিহ্‌সানের* ক্ষেত্রে: যেহেতু এটা মন দ্বারা এবং মন যেটাকে কল্যাণকর মনে করে সেটার দ্বারা চালিত হয় সেহেতু এটা যে অবৈধ তা পরিষ্কার; এটা কোন *শারী'য়াহ্* দলিল নয় এবং এতে গৃহিত কারণটির (*ইল্লাহ্*'র) ক্ষেত্রে *শারী'য়াহ্* দলিলের চেয়ে মনের মধ্যে যে উপলব্ধির জন্ম হয় সেটাকে অধিক প্রধান্য দেয়া হয়। প্রয়োজনীয় বর্ণনা ব্যতিরেকেই এসবকিছু সম্পুর্ন অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই, সাধারণ কর্মচারীকে দায়বদ্ধ করা এবং ব্যক্তিগত কর্মচারীকে দায়বদ্ধ না করার বিষয়টি দলিল ব্যতিরেকেই ধার্য করা হয়েছে যা *শারী'য়াহ্* দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক। সুনান আল-কুরবাতে আল-বাইহাকি কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, আমর বিন-শু'আয়েব তার পিতা হতে ও তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: *"যে ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয় তার উপর কোন দায় নেই"*। একইভাবে, আল-কাসিম বিন আব্দুল রহমান হতে আলী এবং ইবনে মাস্‌উদ বলেছেন যে: "যে ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয় তার উপর কোন দায় নেই" এবং আল-বাইহাকি তার সুনানে যা'বের হতে বর্ণনা করেছেন: আবু বকর ফায়সালা প্রদান করেছিলেন যে, একটি খলিতে রাখা আমানত বা গচ্ছিত সম্পদ যদি আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যায় তবে এবং এর বিনিময়ে কোন জরিমানা আদায় করা যাবে না; সুতরাং যার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় তার কোনরূপ দায় নেই, কারণ এই বর্ণনাটিতে "নেই" এর মাধ্যমে দায় নাকচের বিষয়টি সাধারণ অর্থের দিকে নির্দেশ করে এবং একারনেই ব্যক্তিগত কর্মচারী বা সাধারণ কর্মচারীর যার উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করা হোক না কেন সে এই দায়মুক্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

এর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, *ইস্‌তিহ্‌সান* কোন *শারী'য়াহ্* দলিল হতে আসেনি এবং এরূপ বিবেচনা করাও সঠিক নয় যে এটা *শারী'য়াহ্* দলিল হতে এসেছে। কারণ এর স্বপক্ষে *কুর'আন* কিংবা *সুন্নাহ্* হতে বা সাহাবাদের *ইজ্‌মা* হতে চুড়ান্ত কিংবা সন্দেহযুক্ত কোন প্রমানই নেই যা দলিল হতে এসেছে বলে কোন ইঙ্গিত বহন করে। বাস্তবতা হচ্ছে যে, এটা মনকে দলিল হিসেবে বিবেচনা করে যা এটাকে বাতিল করে দেয় এবং *ইসতিহ্‌সানের* কিছু উদাহরণ *শারী'য়াহ্* দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক।

যারা বলে যে, *আল-মাসালিহ্ আল-মুরসালাহ্ শারী'য়াহ্* দলিল হতে এসেছে, তারাও একইভাবে এর স্বপক্ষে কোন প্রমান পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে; যাহোক, তারা মনে করে যে সমগ্র *শারী'য়াহ্*'র উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বার্থ নিশ্চিত করা এবং ক্ষয়ক্ষতি হতে পরিত্রাণ লাভ করা। একইভাবে তারা মনে করে যে, প্রতিটি *শারী'য়াহ্* হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বার্থ নিশ্চিত করা কিংবা অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়া। যাহোক, তাদের মধ্য হতে কিছু ব্যক্তি *শারী'য়াহ্*'র দলিলে প্রাপ্ত হুকুমের পিছনে কোন একটি স্বার্থ খুজে পাওয়ার বিষয় উল্লিখিত থাকা কিংবা কোন এক ধরনের সুবিধার/কল্যাণের কথা উল্লেখ থাকাকে শর্ত হিসেবে বিবেচনা করে এবং কেউ কেউ এটাকে শর্ত হিসেবে গণ্য করে না; বরং তারা *মাস্‌লাহাহ্*'কে (সুবিধাকে/কল্যাণকে) *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচনা করে যদিওবা কোন *শারী'য়াহ্* দলিলে এ বিষয়ে, কিংবা এটার মতো কোন কিছুর উল্লেখ না থাকে। এর কারণ হচ্ছে যে, এটা সাধারণ *মাসালিহ্*-এর অধীনে আসে যার মাধ্যমে স্বার্থ খোঁজা হয় এবং ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো হয়।

আল-মাসালিহ্ আল-মুর্‌সালাহ্'কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে: যেসব সুবিধার কিংবা সুবিধার ধরনের বিষয়ে কোন *শারী'য়াহ্* দলিল নেই। সুতরাং, *মুরসালাহ্* অর্থ হচ্ছে যে এটি কোন দলিলে উল্লেখ নেই। তারা বলে যে, যদি *মুরসালাহ্* নিজেই কোন সুনির্দিষ্ট *শারী'য়াহ্* দলিলে উল্লেখ থাকত, যেমন: শিক্ষাদান, লেখা-পড়া, কিংবা কোন সাধারণ অনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত দলিলে উল্লেখ থাকত যেখানে এর ধরণ সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায় যা এটাকে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে নিশ্চিত করে, যেমন: সৎকাজের আদেশ ও সকল ধরনের অসৎ কাজের নিষেধ, তবে এদুটি ক্ষেত্রে এগুলো *আল-মাসালিহ্ আল-মুরসালাহ্* হতে এসেছে বলে বিবেচিত হত না, বরং *আল-মাসালিহ্ আল-মুরসালাহ্* দলিল হতে অগ্রবর্তী, ভিন্ন শব্দে বলা যায় যে, এর স্বপক্ষে কোন দলিল পাওয়া যায় না; বরং এটি *শারী'য়াহ্* সম্পর্কে সেই সাধারণ চিন্তা হতে এসেছে যে চিন্তায় মনে করা হয় যে *শারী'য়াহ্* স্বার্থ রক্ষা ও ক্ষতি হতে পরিত্রানের জন্য এসেছে। যাহোক, *শারী'য়াহ্* সম্মত স্বার্থ এবং *শারী'য়াহ্* বহির্ভুত স্বার্থের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে, কারণ

সেগুলোই *শারী'য়াহ্* সম্মত স্বার্থের অন্তর্গত যেগুলো *শারী'য়াহ্* উদ্দেশ্যের (*মাকাসিদ*) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং *শারী'য়াহ্* উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক স্বার্থসমূহ আইনসঙ্গত নয়। সুতরাং, *আল-মাসালিহ্ আল-মুরসালাহ্*সমূহের মধ্য হতে যেগুলো *শারী'য়াহ্* উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সেগুলো *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে এবং যেগুলো *শারী'য়াহ্* উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলো *আল-মাসালিহ্ আল-মুরসালাহ্* হতে এসেছে বলে বিবেচিত হবে না; অতএব এটা কোন *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে গণ্য হবে না। সুতরাং, সেগুলোই *আল-মাসালিহ্ আল-মুরসালাহ্* যেগুলো সম্পর্কে *শারী'য়াহ্* দলিল সাধারণভাবে বিবেচিত হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে, এবং সেই মোতাবেক যখন কোন ঘটনা কিংবা এর সাথে তুলনা করার মত কোন কিছু যদি *শারী'য়াহ্* দলিলে পাওয়া না যায় তখন এর ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট *শারী'য়াহ্* হুকুম তৈরী করা হয় এবং এক্ষেত্রে স্বার্থের বিষয়টি *শারী'য়াহ্* প্রমান হিসেবে বিবেচিত হয়।

এটা হচ্ছে *আল-মাসালিহ্ আল-মুরসালাহ্*'র সারসংক্ষেপ এবং দুটি দৃষ্টিকোন থেকে এটি অবৈধ:

প্রথমত: *কুর'আন* ও *সুন্নাহ্*'র দলিলসমূহ ইবাদতকারীর সুনির্দিষ্ট কাজের সাথে সম্পর্কিত; সুতরাং, কাজটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য *শারী'য়াহ্*'র হুকুমের জন্য এগুলো হচ্ছে *শারী'য়াহ্* দলিল যা স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত নয় এবং স্বার্থের ভিত্তিতে কোন দলিলও আসেনি। যখন আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"তবে অঙ্গীকার গ্রহন কর" (বাকারা: ২৮৩)*, এবং যখন তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"হে মুমিনগণ, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন কর তখন তা লিখে রেখ"* (বাকারা : ২৮২), এবং তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) যখন বলেন: *"যখন তোমরা বেচাকেনা করবে তখন সাক্ষী রাখিবে"* (বাকারা : ২৮২), তখন তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) শুধুমাত্র বন্ধকের, ঋণচুক্তির লিপিবদ্ধ করার এবং বিক্রয়ের সময় সাক্ষীর উপস্থিতির হুকুম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এটা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় ছিল কি ছিল না তা আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) কোন বক্তব্য বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে স্পষ্ট করেননি এবং এই আয়াতও নিকটবর্তী কিংবা দূরবর্তী বা কোন দৃষ্টিকোন থেকেই এই হুকুমটি স্বার্থ ছিল কি ছিল না তা বহন করে না। সুতরাং, কোন্ দৃষ্টিকোন থেকে বলা হয় যে এই স্বার্থের বিষয়টি *শারী'য়াহ্* দ্বারা নির্দেশিত ও এটি বিবেচনা করতে হবে এবং পরবর্তীতে এটিই *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে গন্য করতে হবে?

এছাড়াও *শারী'য়াহ্ ইলাল* (*ইল্লাহ্*'র বহুবচন) *শারী'য়াহ্* দলিলের মতো একইভাবে এসেছে; এটা ইবাদতকারীর কাজের সাথে সম্পর্কিত এবং কাজটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য *শারী'য়াহ্* হুকুমের নির্দেশনার ভিত্তিতে এটি দলিল হিসেবে এসেছে এবং এটি স্বার্থ কিংবা স্বার্থের ইঙ্গিত বর্ণনা করার জন্য আসেনি। সুতরাং, যখন আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"যাতে ধনসম্পদ তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তশালী কেবল তাদের মধ্যে পুঞ্জিভূত না হয়"* (সূরা হাশর: ৭), *"যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহসম্পর্ক ছিন্ন করলে সে সকল নারীদের বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে"* (সূরা আহ্যাব: ৩৭), এবং যখন তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: *"যারা আগ্রহী তাদের হৃদয় আকর্ষনের জন্য "* (সূরা তওবা: ৬০), তখন তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) ধনীদের মধ্যে নয় বরং গরীবদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের *ইল্লাহ্*'র বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন, যাতে করে সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে জায়নাব (রা.)-এর বিবাহের *ইল্লাহ্*'র মাধ্যমে কোন একজন ব্যক্তির জন্য তার পালকপূত্রের স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরে বিবাহের অনুমতি থাকার বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন এবং মানুষের মনকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে অর্থ দেয়ার *ইল্লাহ্*'র মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্য মানুষের মনকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনকে পরিষ্কার করেছেন। সুতরাং, তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেননি যে এটা স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ছিল; বরং এটি স্বার্থের উপস্থিতি কিংবা স্বার্থের অনুপস্থিতির প্রতি কোন দৃষ্টি না দিয়ে এবং স্বার্থের বিষয়টি কোনরূপ বিবেচনায় না এনে সুনিদিষ্ট একটি বিষয় যে কোন হুকুমের *ইল্লাহ্* সেটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং, কোন্ দৃষ্টিকোন থেকে এটা বলা যেতে পারে যে এই কারণগুলোকে *শারী'য়াহ্* নির্দেশ করে যাতে স্বার্থ *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? যদি *শারী'য়াহ্* দলিলে এমন কোন নির্দেশনা না থাকে যে *শারী'য়াহ্* স্বার্থের জন্য এসেছে, অর্থাৎ কোন হুকুমের ক্ষেত্রে যদি *শারী'য়াহ্* স্বার্থের জন্য এসেছে এ নির্দেশনা না থাকে বা এই হুকুমটির *ইল্লাহ্*'র ক্ষেত্রেও যদি কোন *শারী'য়াহ্* নির্দেশনা পাওয়া না যায় তবে এটা বলা সম্ভব নয় যে, *শারী'য়াহ্* দলিল সুনির্দিষ্ট স্বার্থের প্রতি কিংবা স্বার্থের ধরনের প্রতি নির্দেশ করছে, কারণ *শারী'য়াহ্* দলিলে এ বিষয়ে কোন কিছুই আসেনি। অতএব, কোন সুনির্দিষ্ট স্বার্থ কিংবা স্বার্থের ধরনের প্রমান হিসেবে *শারী'য়াহ্* দলিল এসেছে-এ ধরনের দাবির অসারতা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং বৃহত্তর যুক্তি বিচারে *শারী'য়াহ্*'র কোন উৎসতে যেসব স্বার্থের বিষয় উল্লেখ করা হয়নি এসব স্বার্থসমূহ *শারী'য়াহ্* দলিল হতে এসেছে-এরূপ বিবেচনা করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, তারা *আল-মাসালিহ্ আল-মুরসালাহ্*'র জন্য একটি শর্ত তৈরী করেছে যে: *মুরসালাহ্* হতে হলে *শারী'য়াহ্*'র দলিলে এমন কোন বর্ণনা থাকতে পারবে না যার দ্বারা এগুলো সুনির্দিষ্টভাবে কিংবা তাদের ধরনের মাধ্যমে বিবেচিত হতে পারে এবং এক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে এটির জন্য *শারী'য়াহ্* হতে সুনির্দিষ্ট প্রমানের প্রয়োজন নেই, বরং এটি *শারী'য়াহ্*'র উদ্দেশ্য হতে উপলব্ধি করতে হবে। প্রমান না থাকার কারনে *শারী'য়াহ্* দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য এই একটি বিষয়ই যথেষ্ট। যেহেতু হুকুমের জন্য *শারী'য়াহ্*'র দলিল প্রয়োজন এবং মানুষের মন হতে আসা হুকুম গ্রহনীয় নয় সেহেতু এটি প্রত্যাখাত হওয়ার জন্য কোন প্রমান না থাকার বিষয়টিই যথেষ্ট। অতএব, *শারী'য়াহ্* হতে এসেছে বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য প্রমানের উপস্থিতি অপরিহার্য যা নির্দেশ করে যে এটি ওহীর মাধ্যমে, অর্থাৎ *কুর'আন* এবং *সুন্নাহ্*'তে যা এসেছে তাতে পাওয়া যায়। সুতরাং, এটির *শারী'য়াহ্* হতে আসার দাবি প্রত্যাখ্যান করার জন্য এই শর্তই যথেষ্ট যে এটির স্বপক্ষে কোন *শারী'য়াহ্* দলিল থাকবে না।

শারী'য়াহ্'র উদ্দেশ্য হতে *আল-মাসালিহ্ আল-মুরসালাহ্* বুঝতে হয়-এ বিষয়ে বলা যায়: *শারী'য়াহ্*'র উদ্দেশ্যসমূহকে বোধগম্য *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয় না যেখান থেকে হৃদয়ঙ্গম হওয়া কোন কিছুকে প্রমান হিসেবে গণ্য করা যায়; এবং সেগুলোকে *শারী'য়াহ্* হুকুমের জন্য দলিল হিসেবে ব্যবহার করে যে সিদ্ধান্তই নেয়া হোক না কেন তার কোন মূল্য নেই। এছাড়াও, *শারী'য়াহ্*'র উদ্দেশ্য বলতে কি বোঝানো হয়? যদি এর অর্থ এটা হয় যে, দলিল যেটার দিকে নির্দেশ করে সেটাই এর উদ্দেশ্য, যেমন: ইসলামে ব্যভিচার, চুরি, হত্যা, মদ এবং ধর্মত্যাগ নিষিদ্ধ তবে এটি *শারী'য়াহ্*'র উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি হচ্ছে ইবাদতকারীর কাজের জন্য নাযিলকৃত বিধান এবং এক্ষেত্রে দলিলের নির্দেশনার পিছনের কারণ বা উদ্দেশ্য খোঁজার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং *শারী'য়াহ্*'র উৎসের বিষয়বস্তু হতে অনুধাবন করা কোন আইনকে *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচনা করার কোন সুযোগ নেই; বরং এটা শুধুমাত্র একটি *শারী'য়াহ্* হুকুম। বৃহত্তর যুক্তি প্রয়োগে, মানুষের মন *শারী'য়াহ্* দলিল হতে আসা *শারী'য়াহ্* আইনকে *শারী'য়াহ্*'র উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করে যেটাই কল্পনা করুক না কেন সেটার কোন মূল্য নেই। সুতরাং, নিছক কল্পনাকে *শারী'য়াহ্*'র উদ্দেশ্য হিসেবে বিচেনা করে সেই কল্পনা হতে কোন কিছু অনুধাবন করলে সেটা কিভাবে *শারী'য়াহ্*'র দলিল হিসেবে গণ্য হতে পারে? এর ভিত্তিতে *শারী'য়াহ্*'র উদ্দেশ্য হতে যেটাই অনুধাবন করা হোক না কেন তা সম্পূর্ণরূপে এবং চূড়ান্তভাবে বাতিল।

শারী'য়াহ্'র জ্ঞান (*হিক্‌মা*) হতে উপলব্ধির মাধ্যমে যেটার দিকে উদ্দিষ্ট করা হয়েছে, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা.) প্রেরণের পিছনে উদ্দেশ্য বা বাস্তবতা হচ্ছে যে তাকে (সা.) সকল সৃষ্টির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছিল, তাই এটা হচ্ছে *হিক্‌মা*, *ইল্লাহ্* নয় এবং *হিক্‌মা* পাওয়া যেতেও পারে কিংবা পাওয়া নাও যেতে পারে। সেই মোতাবেক, এটি না পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকার কারনে এটিকে দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার ভিত্তি হিসেবে নেয়া যাবে না; অতএব, বৃহত্তর যুক্তিবিচারে *হিক্‌মা* হতে যা অনুধাবন করা যায় সেটাকে দলিলের জন্য ব্যবহৃত ভিত্তি হিসেবে নেয়া যাবে না।

এই কারনে এটা বিবেচনা করা ঠিক হবে না যে, *শারী'য়াহ্*'র উদ্দেশ্য হিসেবে কল্পনা করে নেয়া কোন কিছু হতে যা বোঝা যায় তা *শারী'য়াহ্* দলিল হতে এসেছে। এটা এই দৃষ্টিকোন থেকেও সম্পূর্ণরূপে অবৈধ যে, *শারী'য়াহ্*'র উদ্দেশ্য হিসেবে অনুমান করে নেয়া কোন কিছু *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অতএব, *আল-মাসালিহ্ আল-মুরসালাহ্ শারী'য়াহ্* দলিল হতে এসেছে-এরূপ ধারণা যে অবৈধ তা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

এসব কারনে তারা *আল-মাসালিহ্ আল-মুরসালাহ্‌কে শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। *শারী'য়াহ্* প্রমানের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো যে *শারী'য়াহ্* দলিল হতে এসেছে তার স্বপক্ষে কুর'আন কিংবা সুন্নাহ্ হতে চূড়ান্তভাবে প্রমানিত বা অপ্রমানিত কোন ধরনের *শারী'য়াহ্* প্রমান নেই। এই কারনে *আল-মাসালিহ্ আল-মুরসালাহ্ শারী'য়াহ্* দলিল হতে এসেছে-এটা বিবেচনা করা সঠিক নয়।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার যে, আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) হতে ওহী হিসেবে আসা সুনির্দিষ্ট প্রমান সহকারে চূড়ান্তভাবে প্রমানিত দলিলসমূহ হচ্ছে চারটি এবং এগুলো ব্যতিত অন্য কোন কিছু গ্রহনযোগ্য নয়, এবং দলিলগুলো হচ্ছে: *কুর'আন*, *সুন্নাহ্*, সাহাবাদের *ইজ্মা* এবং সেসব *ক্বিয়াস* যেগুলোর *ইল্লাহ্ শারী'য়াহ্* হতে এসেছে। এই চারটি দলিল ব্যতিত অন্যগুলোর স্বপক্ষে কোন ধরনের সুনির্দিষ্ট প্রমান নেই যা সেগুলোকে প্রমানিত করতে পারে। অতএব এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে শুধুমাত্র এই চারটিকেই বিবেচনা করা যাবে।

যাহোক, এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে এই চারটি ব্যতিত অন্য কোন দলিল হতে উদ্ভুত হুকুমসমূহের মধ্য হতে যেসব হুকুমকে একজন *ঈমাম শারী'য়াহ্* হুকুম হিসেবে বিবেচনা করেন তবে সেসব হুকুমগুলোকে যারা সমর্থন করে কিংবা যারা সেগুলোর বিরোধিতা করে, দলিল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার শর্ত পূরণ না করলেও অস্পষ্ট দলিলের কারনে তাদের সকলের দৃষ্টিতে সেগুলো *শারী'য়াহ্* হুকুম হিসেবে বিবেচিত হবে। অতএব, *উম্মাহ্*'র সাধারণ ঐক্যমত্যকে *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচনা করে সেটা থেকে কেউ যদি হুকুম বের করে তবে পর্যায়ক্রমে হুকুমটি তার দৃষ্টিতে *শারী'য়াহ্* হুকুম হিসেবে পরিগনিত হবে এবং সেটি একটি বাধ্যতামূলক *শারী'য়াহ্* হুকুম হিসেবে তার উপর প্রযোজ্য হবে, তখন সে সেটির পরিবর্তে অন্য কোন হুকুম নিতে পারবে না। এই হুকুমটিকে যারা বিরোধিতা করে তাদের দৃষ্টিতেও সেটি *শারী'য়াহ্* হুকুম হিসেবে বিবেচিত হবে, কিন্তু সেটা তাদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক *শারী'য়াহ্* হুকুম হিসেবে প্রযোজ্য হবে না। একই সিদ্ধান্ত তাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে যারা মনে করে যে: "আমাদের পূর্ববর্তীগণের *শারী'য়াহ্* আমাদের জন্যও *শারী'য়াহ্*" এবং যারা *আল-মাসালিহ্ আল-মুরসালাহ্*, *ইস্তিহ্সান* এবং যৌক্তিক চিন্তায় বিশ্বাস করে।

অতএব, এগুলোর মধ্য হতে যেকোন দলিল হতে উদ্ভুত প্রতিটি হুকুম সেসব ব্যক্তির দৃষ্টিতে *শারী'য়াহ্* হুকুম হিসেবে বিবেচিত হবে যারা সমর্থন করে যে হুকুমটি *শারী'য়াহ্* দলিলের অংশ হতে উদ্ভুত হয়েছে, এবং যাদের দৃষ্টিতে সেটা সমর্থনযোগ্য নয় তাদের জন্যও তা *শারী'য়াহ্* হুকুম হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু হুকুমটি তার জন্যই বাধ্যতামূলক যে এটা বের করে এবং তার জন্য বাধ্যতামূলক নয় যে ভিন্ন মত পোষন করে। এটা হচ্ছে *শারী'য়াহ্* দলিল হতে উদ্ভুত হুকুমের মতো, কারণ দলিলের উপলব্ধির ভিন্নতার দ্বারা উদ্ভুত *শারী'য়াহ্* হুকুমের ক্ষেত্রে যে এটা বের করে তার দৃষ্টিতে হুকুমটি বৈধ এবং যে ভিন্ন মত পোষনের ফলে বিরোধিতা করে তার দৃষ্টিতে সেটি অবৈধ পরিগণিত হবে না। বরং, এটা সকল মুসলিমের দৃষ্টিতে ততক্ষন পর্যন্ত একটি *শারী'য়াহ্* হুকুম বলেই বিবেচিত হবে যতক্ষন পর্যন্ত *শারী'য়াহ্* দলিল হতে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সুযোগ থাকে; ভিন্ন শব্দে বলা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সন্দেহযুক্ত দলিলের (*সুব্হাত্ দালিল*) অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যাহোক, হুকুমটি সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক *শারী'য়াহ্* হুকুম হিসেবে বিবেচিত হবে না, কিন্তু যে এটা বের করেছে এবং যে এটা অনুসরণ করেছে তার জন্য এটা মানা বাধ্যতামূলক হবে এবং যে এটির বিরোধিতা করেছে তার জন্য এটা মানা বাধ্যতামূলক হবে না। তবুও, যেকোন অবস্থাতেই এটা *শারী'য়াহ্* হুকুম হিসেবেই বিবেচিত হবে। একইভাবে, *শারী'য়াহ্* দলিল হতে উদ্ভুত হুকুম *শারী'য়াহ্* উৎস হতে উদ্ভুত হুকুমের মতোই এবং এটা সকল মুসলিমের দৃষ্টিতে *শারী'য়াহ্* হুকুম হিসেবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে কারা দলিলটিকে *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচনা করে কিংবা কারা এটিকে *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচনা করে না তা বিবেচ্য বিষয় হবে না, কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্যই সন্দেহযুক্ত দলিলের অস্তিত্ব থাকতে হবে, উদাহরণ স্বরূপ: পূর্ববর্তী দলিলসমূহকে *শারী'য়াহ্* দলিল হিসেবে বিবেচনাকারীদের প্রদত্ত যুক্তি যা আমরা খন্ডন করেছিলাম।

ধারা ১৩

প্রাথমিকভাবে প্রতিটি ব্যক্তি নির্দোষ হিসেবে বিবেচিত হবে। আদালতের রায় ব্যতিত কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কাউকে নির্যাতন করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ; এবং যে নির্যাতন করবে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে।

এই ধারাটিতে তিনটি বিষয় রয়েছে: নির্দোষীতার মূলনীতি, বিচারকের রায় ব্যতিরেকে শাস্তি আরোপের নিষিদ্ধতা এবং নির্যাতন করার উপর নিষেধাজ্ঞা।

প্রথম বিষয়টির ক্ষেত্রে: ওয়া'ইল-ইবনে হাজ্‌র-এর বর্ণনা হতে এ বিষয়টির স্বপক্ষে দলিল উদ্ভুত হয়েছে। তিনি বলেছেন: ***"রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে হাজ্‌রা মাউত হতে একজন ব্যক্তি এবং কিনদাহ্ হতে একজন ব্যক্তি এসেছিল। হাজ্‌রা মাউত হতে আসা ব্যক্তিটি বলেছিল: "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.), এই ব্যক্তিটি আমার বাবার মালিকানাধীন জমি হতে জমি নিয়েছে। কিনদাহ্ হতে আসা ব্যক্তিটি বলেছিল: "এটা আমার জমি, এটা আমার অধীনে রয়েছে এবং আমি এটা আবাদ করছি। এটার উপর তার কোন অধিকার নেই "। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) হাজ্‌রা মাউত থেকে আসা ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার কাছে কি কোন প্রমাণ আছে?" সে বলেছিল: "না", তার উত্তরের ওপরে ভিত্তি করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বল্লেন: "তাহলে এক্ষেত্রে তোমার কাছে তার সাক্ষ্য (শপথ) থাকবে।" সে বলেছিল: "হে আল্লাহ্‌র রাসুল (সা.), সে একজন বিদ্রোহী, সে তার শপথের কোন পরোয়া করে না এবং সে কোন কিছু ভয় করে না"। তিনি (সা.) বল্লেন: "এই শপথ ব্যতিত তার উপর তোমার আর কোন অধিকার নেই"*** (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)। তিনি (সা.) আরও বলেছিলেন: ***"প্রমাণ দেয়ার দায়ভার বাদীর (অভিযোগকারীর) উপর এবং শপথ করার ভার বিবাদীর উপর"*** (*সহীহ্* সনদ সহকারে আল-বাইহাকি কর্তৃক বর্ণিত)। প্রথম বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বাদীকে প্রমাণ দেয়ার দায়ভার অর্পণ করেছিলেন এবং এর অর্থ হচ্ছে যে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত বিবাদী নির্দোষ; দ্বিতীয় বর্ণনাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ব্যাখ্যা করেছেন যে, মৌলিকভাবে বাদী কর্তৃক প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়া উচিত। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত বিবাদী যে নির্দোষ তার দলিল হচ্ছে এই হাদিস।

দ্বিতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে: রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বক্তব্য হতে এর দলিল উদ্ভুত হয়েছে: ***"আমি যদি কারও সম্পদ নিয়ে থাকি তবে এই রইল আমার সম্পদ, তাকে এখান থেকে নিতে দাও, এবং আমি যদি কারও পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করে থাকি তবে এই আমার পৃষ্ঠদেশ, তাকে এখানে কশাঘাত করতে দাও"*** (আল-ফাদল্ বিন আব্বাস হতে আবু ই'য়ালা কর্তৃক বর্ণিত)। আল-হাইথামি বলেছেন যে, আবু ই'য়ালা 'আতা বিন মুসলিমের সনদে ইবনে হিব্বান বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে প্রমাণিত, তবে অন্যরা তাকে দুর্বল বলে দাবি করেছেন, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিরা নির্ভরযোগ্য হিসেবে স্বীকৃত। আল্-তাবারানি'র আল-মু'যাম আল-আওসাত-এ এই শব্দসমূহ সহকারে বর্ণিত আছে যে - ***"আমি যদি কারও পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করে থাকি তবে এই আমার পৃষ্ঠদেশ, তাকে এখানে একইরকমভাবে কশাঘাত করতে দাও, এবং আমি যদি কারও সম্মানহানি করে থাকি তবে এই আমার সম্মান, তাকে একইরকমভাবে আমার সম্মানহানি করতে দাও, এবং আমি যদি কারও কাছ থেকে সম্পদ নিয়ে থাকি তবে এই রইল আমার সম্পদ, তাকে একইরকমভাবে আমার সম্পদ নিতে দাও"***, এবং ইবনে কাছিরের *আল-বিদায়াহ্ ওয়াল নিহায়াহ্*'তে বর্ণনাটি এরূপ শব্দসহকারে এসেছে - ***"আমি যদি কারও পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করে থাকি তবে এই আমার পৃষ্ঠদেশ, তাকেও একইরকমভাবে এখানে কশাঘাত করতে দাও, এবং আমি যদি কারও সম্পদ নিয়ে থাকি তবে এই রইল আমার সম্পদ, সুতরাং এ থেকে নিয়ে যাও, এবং আমি যদি কারও সম্মানহানি করে থাকি তবে এই আমার সম্মান, তাকে একইরকমভাবে আমার সম্মানহানি করতে দাও"***। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শাসক হিসেবে পদাধিকার বলে একথা বলেছিলেন; এর অর্থ হচ্ছে যে, যাকে ভুলক্রমে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তাকে আমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে দাও এবং এটি এ বিষয়ের দলিল যে শাস্তি পাবার যোগ্য হিসেবে উপযুক্ত প্রমাণ প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে কাউকে শাস্তি প্রদান করা শাসকের জন্য নিষিদ্ধ। এছাড়াও, মুলা'নাহ্‌র কাহিনীতে (সাক্ষী ব্যতিরেকে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ) বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: ***"যদি আমি প্রমাণ ব্যতিরেকে কাউকে পাথর মেরে হত্যা করতাম তবে আমি তাকে (মহিলাটিকে) পাথর মারার নির্দেশ দিতাম"*** (উভয়ের সম্মতি রয়েছে এবং এর শব্দসমূহ মুসলিমের), এবং এর অর্থ হচ্ছে যে, মহিলাটির উপরে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে পাথর মারেননি। ইব্‌নে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা এই ধারনাটি নিশ্চিত হয়েছে, হাদিসটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দম্পতিটির উপর মুলা'নাহ্ বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন (সূরা নূর-এর ৪ থেকে ৯ নম্বর আয়াতের মধ্যে এ সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে), বর্ণনাটিতে এসেছে যে, ***"মানুষের জমায়েত হতে একজন ব্যক্তি ইব্‌নে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করে যে: "এই কি সেই মহিলা যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছিলেন: "যদি আমি প্রমাণ ব্যতিরেকে কাউকে পাথর মারার নির্দেশ***

দিতাম তবে আমি অমুক ও অমুক মহিলাকে পাথর মারতাম?"" তিনি উত্তরে বলেছিলেন: "No, that was a woman who used to display vice after Islam"" (উভয়ে সম্মত)। অর্থাৎ, মহিলাটি হঠকারী/অশ্লীল ছিল কিন্তু সেটা প্রমাণিত হয়নি; এ বিষয়ে না কোন প্রমাণ ছিল, কিংবা না মহিলাটি স্বীকার করে নিয়েছিল। অতএব, এর অর্থ হচ্ছে- যদিওবা সেখানে ব্যভিচারের সন্দেহ বিদ্যমান ছিল, তথাপি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে পাথর মারার নির্দেশ দেননি, কারণ অভিযোগ সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি, এবং এজন্যেই তিনি (সা.) বলেছিলেন: *"যদি আমি কাউকে পাথর মারতাম তবে অমুক ও অমুক মহিলাকে পাথর মারতাম"*। আরবী ভাষায় *"যদি"* সংযোগ শব্দটি কোন কিছুর অনুপস্থিতির ফলে সৃষ্ট বিরতির প্রতি নির্দেশ করে। ফলশ্রুতিতে, প্রমাণের অনুপস্থিতির কারণে পাথর নিক্ষেপের শাস্তি বাস্তবায়ন করা হয়নি। এটি এ বিষয়ের দলিল যে, অভিযুক্তদের কাউকে শাস্তি প্রদান করা শাসকের জন্য নিষিদ্ধ, যদিনা সে এমন কোন অপরাধ করে যা শারীয়াহ্ দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং আদালতে একজন যোগ্য বিচারকের সামনে তার অপরাধ প্রমাণিত হয়। কারণ, আদালতে একজন যোগ্য বিচারকের সামনে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা না হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

তবে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে, অর্থাৎ আদালতের উপস্থিতিতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খতিয়ে দেখার আগ পর্যন্ত শাসক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করে রাখার, বা নিজের হেফাজতে রাখার অধিকার সংরক্ষণ করেন। কিন্তু এই আটকাবস্থা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হতে হবে। অনির্দিষ্ট কাল ধরে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করে রাখা সমীচিন হবে না। এর ব্যপ্তিকাল সংক্ষিপ্ত হতে হবে। এই অবরুদ্ধ করে রাখার অনুমোদনের স্বপক্ষে আল-তিরমিযি কর্তৃক বর্ণিত একটি *হাসান* হাদিস হতে এর দলিল উদ্ভুত হয়েছে যা আহ্মাদ'ও বর্ণনা করেছেন, এবং আল-হাকিম বলেছেন যে হাদিসটির *সহীহ্* সনদ রয়েছে, বাহায্ বিন হাকিম তার পিতা হতে এবং তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে: *"আল্লাহ্র রাসূল (সা.) একজন ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে আনীত কোন একটি অপরাধ সম্পাদনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে অবরুদ্ধ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন"*। একইভাবে, আবু-হুরায়রা হতে আল-হাকিম কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে: *"আল্লাহ্র রাসূল (সা.) কোন এক ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে একদিন ও একরাতের জন্য অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন"*, এবং যদিওবা সনদটিতে ইব্রাহীম্ বিন খাইতাম্ নামক বিতর্কিত একজন ব্যক্তিও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, তথাপি আল-বাইহাকি কর্তৃক *আল-কুব্রা'*তে ও ইব্নে আল্- মারুদ কর্তৃক *আল-মুন্তাকি'*তে বাহ্যি বিন হাকিম বিন মু'আবিয়াহ্ তার পিতা হতে ও তার পিতা তার পিতামহ থেকে অন্যান্য সনদ হতে বর্ণিত রয়েছে যে, *"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন এক ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে আনীত অপরাধের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সেই দিনের মাঝামাঝি হতে এক ঘন্টার জন্য অবরুদ্ধ করে রাখেন এবং এরপর তাকে ছেড়ে দেন"*। এসবকিছু সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য অবরুদ্ধ করে রাখার স্বপক্ষে দলিল এবং এর ব্যপ্তি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্চনীয়, কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অভিযুক্ত ব্যক্তিটিকে একদিন ও একরাতের জন্য অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন, এবং তিনি (সা.) তাকে দিবাকালীন সময়ে একঘন্টা অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। এর পাশাপাশি, এই আটকাবস্থা কোন শাস্তি হিসেবে নয়, বরং তদন্তে সহযোগিতার নিমিত্তে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।

তৃতীয় বিষয়টির ক্ষেত্রে: এটি কারও বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের নিষেধাজ্ঞাকে নির্দেশ করে; এছাড়াও এটি এমন কোন শাস্তি প্রদানকে নিষিদ্ধ করে যা আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) মৃত্যু পরবর্তী জীবনে, অর্থাৎ জাহান্নামের শাস্তি হিসেবে ধার্য করেছেন, in other words the prohibition of punishing by burning with fire. । অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে শাস্তি প্রদানের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদিস হতে দলিল উদ্ভুত হয়েছে; এ বর্ণনাতে উল্লেখ আছে যে, তিনি (সা.) বলেছেন: *"যদি আমি কাউকে প্রমাণ ব্যতিরেকে পাথর মারার নির্দেশ দিতাম তবে আমি মহিলাটিকে পাথর মারতাম"* (ইব্নে আব্বাস হতে বর্ণিত এবং উভয়ে একমত); ইব্নে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে যে, মহিলাটি ব্যভিচারিণী হিসেবে পরিচিত ছিল। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য শাস্তি প্রদানের অনুমোদন থাকত তবে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) ঐ মহিলাটির কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নির্যাতন করতে পারতেন। কারণ এটা জানা ছিল যে, সে তার অবৈধ কাজের বিষয়ে বিবেকহীন ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অতএব, অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহার করা নিষেধ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অপমান করা, কিংবা কোন ধরণের শাস্তি প্রদান করা নিষেধ। এ বিষয়টি ইব্নে আব্বাসের বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত: *"একজন লোক মদপান করেছিল এবং মাতাল হয়ে পড়েছিল; তাকে একটি গিরিপথে টলটলায়মান অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। যখন সে আব্বাসের বাড়ির নিকটবর্তী হয় তখন প্রহরীকে এড়িয়ে আব্বাসের বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তার পিছনে লুকিয়ে পড়ে। তারা ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্*

(সা.)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি (সা.) হেসে দেন এবং বলেন, "সে কি এটা করেছে?" তখন তিনি (সা.) অভিযুক্ত ব্যক্তিটিকে কোন শাস্তি প্রদানের আদেশ দেননি" (আবু দাউদ এবং আবু দাউদের শব্দ সহকারে আহ্‌মদ কর্তৃক বর্ণিত)। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ব্যক্তিটিকে কোন শাস্তি প্রদান করেননি, কারণ সে অপরাধ স্বীকার করেনি, কিংবা তার উপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিতও হয়নি। এর অর্থ হচ্ছে যে, সে মদপানের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু তা প্রমাণিত হয়নি এবং স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাকে নির্যাতনও করা হয়নি, এবং শুধুমাত্র অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাকে কোনরূপ শাস্তি প্রদান করা হয়নি। অতএব, একজন যোগ্য কাজী ও আদালতের সামনে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে কোন শাস্তি আরোপ করা অন্যায় হবে।

রাসূলুল্লাহ্'র (সা.) সামনে আলী (রা.) তাঁর (সা.) দাসী বালিকাকে প্রহার করেছেন, এরূপ "*আল-ইফ্‌ক*" (আয়শা (রা.) সম্পর্কে গুজব) সম্পর্কিত বর্ণনা সম্পর্কে বলা যায়- এটা মানতে হবে যে দাসী বালিকাটি অভিযুক্ত ছিল না; অতএব অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহারের অনুমোদনের স্বপক্ষে এটি দলিল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়াও আলী (রা.) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) দাসী বুরাইরাহ্-এর প্রহৃত হওয়া সম্পর্কে বুখারী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা.) বলেছিলেন: "দাসীকে জিজ্ঞাসা করুন"। যিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। বুখারী এটা উল্লেখ করেননি যে, আলী (রা.) দাসীকে প্রহার করেছেন। বর্ণনাটি হতে উদ্ধৃতি হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে: ***"আলী (রা.) বলেছিলেন - হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.), আল্লাহ্ আপনার জন্য এ বিষয়টিকে কঠিন করেননি এবং সেখানে দাসীটি ছাড়াও আরও অনেক মহিলা উপস্থিত ছিল, এবং আপনি যদি দাসীটিকে জিজ্ঞেস করেন তবে সেও আপনাকে সত্য বলতে পারে।" সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দাসীটিকে তলব করেন এবং বলেন :"হে বুরাইরাহ্!....."***। আল-বুখারী'র আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে, ***"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার বাড়িতে আসেন এবং আমার দাসীকে জিজ্ঞেস করেন, উত্তরে সে বলেছিল: "আল্লাহ্‌র কসম, "না" আমি কোন দোষ-ত্রুটির বিষয়ে জানি না; শুধুমাত্র একটি সত্য বিষয় ব্যতিত যে, তিনি এমন অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েন যখন ভেড়া প্রবেশ করতে পারে এবং মাখানো ময়দার মন্ড খেয়ে ফেলতে পারে। তার (সা.) কিছু সাথী দাসীকে তিরস্কার করেন এবং বলেন: "রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা.) সত্য বল....."*** এবং আল-বুখারী এটা উল্লেখ করেননি যে, আলী (রা.) দাসীকে প্রহার করেছেন।

যাহোক, অন্যান্য বর্ণনায় এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলী (রা.) দাসীকে প্রহার করেছেন। ইবনে হিশাম উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (রা.) প্রহার করেছেন। ইবনে হিশামের *সীরাহ্'*তে বর্ণিত আছে যে- ***"আলীর ক্ষেত্রে, তিনি বলেছিলেন: "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.), অনেক মহিলা উপস্থিত রয়েছে এবং আপনি সহজেই একজনের বদলে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতে পারেন; দাসীটিকে জিজ্ঞেস করুন, সে আপনাকে সত্য বলতে পারবে"। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বুরাইরাহ্'কে জিজ্ঞেস করার জন্য ডাকলেন, এবং তখন আলী উঠে দাড়িয়ে দাসীটিকে প্রবলভাবে প্রহার করলেন এবং বলতে লাগলেন: "রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা.) সত্য বল"। তখন দাসীটি বলেছিল: "আমি তার সম্পর্কে শুধুমাত্র উত্তম বিষয়ই জানি"***। এই বর্ণনাটিকে যথেষ্ট হিসেবে ধরে নিলেও এটি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহারের অনুমোদনকে নির্দেশ করে না। কারণ, এই মামলায় দাসী বুরাইরাহ্ অভিযুক্ত ছিল না এবং এটা বলা যাবে না যে, সে একজন সাক্ষী ছিল। সাক্ষী হওয়ার কারণে তাকে প্রহার করা হয়নি। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অন্যান্যদেরও জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিন্তু তাদেরকে প্রহার করেননি। তিনি (সা.) যায়নাব বিনতে জাহ্‌সকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন এবং তাকে প্রহার করেননি। যদিওবা তার বোন, হামনাহ্ বিনতে জাহ্‌স আয়শা (রা.) সম্পর্কে গুজব রটিয়েছিল। '*আল-ইফ্‌ক*'-এর বর্ণনায় আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন: ***".....এবং তার বোন হামনাহ্ লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাথে সাথে সেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে"***। তথাপি, যায়নাবকে সন্দেহ করা হয়েছিল যে, সে কিছু জানে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল; কিন্তু তাকে কখনই প্রহার করা হয়নি। অতএব, এটা বলা ভুল হবে যে, সাক্ষী হওয়ার দরুন বুরাইরাহ্'কে প্রহার করা হয়েছিল; বরং রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) দাসী হিসেবে তাকে প্রহার করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার দাসীকে প্রহার করার এবং প্রহারের আদেশ প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার দাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তিনি (সা.) অন্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করেন। একইসাথে, আলী (রা.) যখন দাসীটিকে প্রহার করেন ও অন্যান্য সাহাবীরা তাকে প্রচন্ড তিরষ্কার করতে থাকেন, তখন তিনি (সা.) নীরব ছিলেন। যাহোক, তিনি (সা.) আর কাউকে প্রহার করেননি কিংবা অন্য কাউকে প্রহারের সময়ে নীরব থাকেননি। এ বিষয়টি এটাই নির্দেশ করে যে, তিনি (সা.) তাকে প্রহারের অনুমতি দিয়েছিলেন; কারণ সে ছিল তার (সা.) দাসী এবং যে কেউ নিয়মানুবর্তিতা কিংবা কোন বিষয়ে তদন্তের উদ্দেশ্যে নিজের দাসীকে প্রহারের অধিকার সংরক্ষন করে। অতএব, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহারের অনুমোদনের পক্ষে এই বর্ণনাটিকে দলিল ব্যবহার করা যাবে না, বরং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহার নিষিদ্ধ - এ বিষয়ে দলিলের উপস্থিতি রয়েছে; এটি রাসুলুল্লাহ্'র (সা.) বক্তব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে: ***"যদি আমি বিনা প্রমাণে কাউকে পাথর মারতাম তবে তাকে পাথর মারতাম"*** (ইব্‌নে আব্বাস হতে উভয় কর্তৃক ঐক্যমত্য রয়েছে)। অতএব, অভিযুক্ত

ব্যক্তিকে প্রহার করা, অপমান করা, তিরস্কার করা, কিংবা নির্যাতন করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তবে তাকে অবরুদ্ধ করে রাখার অনুমোদন রয়েছে, কারণ তার বিষয়ে তথ্য প্রমাণ বিদ্যমান।

এই হচ্ছে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণের পূর্বে তার উপর শাস্তি আরোপের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে আলোচনা। মৃর্ত্যু পরবর্তী জীবনে আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) যে শাস্তি প্রদান করবেন, সেই শাস্তি আরোপের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে বলা যায় যে, ইক্রিমাহ্ হতে আল-বুখারী কর্তৃক বর্ণিত বক্তব্য হতে এর দলিল পাওয়া যায়: ***"বিশ্বাসীদের আমির আলীর (রা.) সামনে একদল ধর্মত্যাগী ব্যক্তিকে আনা হয়েছিল এবং তিনি তাদেরকে আগুনের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করেন; ইবনে আব্বাস এটা শুনেছিলেন এবং বলেছিলেন: যদি আমি তার জায়গায় থাকতাম তবে আমি তাদেরকে আগুন দিয়ে শাস্তি দিতাম না, কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেটা বলে এটা নিষিদ্ধ করেছেন সেটা হচ্ছে: "আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) যা দিয়ে শাস্তি দেবেন তা দিয়ে তোমরা শাস্তি দিয়ো না"***। আবু হুরায়রাহ্ হতে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: ***"আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারে না"***। ইবনে মাসু'দের বর্ণনা হতে এই শব্দসমূহ সহকারে আবু দাউদ বিবৃত করেছেন: ***"এটা উচিত নয় যে আগুনের সৃষ্টিকর্তা ব্যতিত অন্য কেউ কাউকে আগুন দিয়ে শাস্তি প্রদান করবে"***। অতএব, যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যোগ্য বিচারকের সামনে আদালতে উপস্থিত করা হয় এবং তার অপরাধ প্রমাণিত হয় তবে তাকে আগুন কিংবা আগুনের মতো কোন কিছু, যেমন: বিদ্যুৎ দ্বারা শাস্তি প্রদান করা যাবে না, এবং আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) যেসব দ্বারা শাস্তি প্রদান করবেন, সেগুলোর কোনটি ব্যবহার করে শাস্তি দেয়া যাবে না। এছাড়াও, আইনপ্রণেতা (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) যেসব শাস্তির বিধান প্রদান করেননি সেসব শাস্তিও দেয়া যাবে না। এর কারণ হচ্ছে, আইনপ্রণেতা (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) অপরাধীদের জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধিবিধান প্রদান করেছেন, এবং এগুলো হচ্ছে: হত্যা, চাবুক মারা, পাথর নিক্ষেপ, নির্বাসন, অঙ্গচ্ছেদ ও কারাদন্ড, সম্পত্তি ধ্বংস, জরিমানা আরোপ, নিন্দাবাদ এবং শরীরের কোন অংশে ছেঁকা দিয়ে চিহ্নিতকরণ। কারও উপর এগুলো ব্যতিত অন্য কোন শাস্তি আরোপ করা নিষিদ্ধ। অতএব, কাউকে আগুন দিয়ে পোড়ানোর শাস্তি দেয়া যাবে না, যদিওবা তার সম্পত্তি আগুন দিয়ে পোড়ানো যাবে, এবং কারও নখ বা ভুরু উপড়ে ফেলে, তড়িতাহত করে, ডুবিয়ে, শরীরে ঠান্ডা পানি প্রবাহিত করে, ক্ষুধার্ত রেখে, ঠান্ডায় জমিয়ে কিংবা এ ধরণের কোন পদ্ধতিতে শাস্তি দেয়া যাবে না। অপরাধী ব্যক্তিকে শুধুমাত্র *শারীয়াহ্* দ্বারা নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করতে হবে এবং এগুলো ব্যতিত অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা শাসকের জন্য নিষিদ্ধ। অতএব, কাউকে নির্যাতন করা সম্পূর্ণরূপ নিষিদ্ধ এবং যে এধরণের কাজ করবে সে *শারীয়াহ্* অমান্য করবে। যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, কেউ কাউকে নির্যাতন করেছে তবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। এগুলো হচ্ছে এই ধারার স্বপক্ষে দলিল।

ধারা ১৪

প্রকৃতপক্ষে সকল ধরণের কাজ *শারীয়াহ্* বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। অতএব, কোন কাজের বিষয়ে *শারীয়াহ্* হুকুম জানা না থাকলে তা সম্পাদন করা যাবে না। অন্যদিকে, বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন দলিল পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তা মুবাহ্ (অনুমোদিত) হিসেবে বিবেচিত হবে।

একজন মুসলিমকে *শারীয়াহ্* মোতাবেক কাজ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"তবে না; আপনার রবের কসম! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা আপনার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে সেসব বিবাদ-বিসম্বাদের যা তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়"*** (নিসা: ৬৫)।

আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন: ***"আর রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক"*** (হাশর: ৭)।

অতএব, মূল বিষয় হচ্ছে যে মুসলিম নিজেকে *শারীয়াহ্* বিধিবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। এর পাশাপাশি, *শারীয়াহ্*'র মূলনীতির মধ্যে আছে যে- ***"শারীয়াহ্ আবির্ভাবের পূর্বে কোন বিধান নয়"***। ভিন্ন শব্দে, কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বিধান আবির্ভাবের পূর্বে সে বিষয়ের জন্য কোন হুকুম দেয়া যাবে না। অতএব, আল্লাহ্র হুকুম আসার পূর্বে কোন বিষয়ের জন্য কোন হুকুম স্থির করা যাবে না; অর্থাৎ, কোন বিষয়কে অনুমোদিত (*ইবাহাহ্*) হিসেবে হুকুম প্রদান করা যাবে না। *ইবাহাহ্* হচ্ছে একটি *শারীয়াহ্* হুকুম যা আইনপ্রণেতার ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে; অন্যথায় এটি *শারীয়াহ্* হুকুম হিসেবে বিবেচিত হবে না। এর কারণ হল, *শারীয়াহ্* হুকুম হচ্ছে আইনপ্রণেতার বক্তব্য যা ইবাদতকারীর কাজের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং, যা আইনপ্রণেতার ওহীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি তা *শারীয়াহ্* হুকুম হিসেবে গণ্য হতে পারে না। অতএব, অনুমোদনের অর্থ নিষিদ্ধের হুকুমের অনুপস্থিতি নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে *মুবাহ্* (অনুমোদিত) হওয়ার পক্ষে *শারীয়াহ্* দলিলের আবির্ভাব; ভিন্ন শব্দে বলা যায়, আইনপ্রণেতার পক্ষ হতে আসা কোন কাজ করার কিংবা বিরত থাকার অনুমোদনের বিধান। অতএব, মূল বিষয় হচ্ছে আইনপ্রণেতার ওহী মোতাবেক হুকুম মেনে চলা, *ইবাহাহ্* নয়; কারণ, *ইবাহাহ্*'র হুকুমের বৈধতার জন্যও আইনপ্রনেতার ওহীর মাধ্যমে সেটার স্বীকৃতি প্রয়োজন; এটি একটি সাধারণ মূলনীতি যা কাজ এবং বস্তুর উপর প্রযোজ্য। সুতরাং, যদি একজন মুসলিম কোন কাজ করতে চায় তবে এটা তার জন্য অবশ্যপালনীয় যে, সে আল্লাহ্র (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) প্রদত্ত হুকুম মোতাবেক কাজটি সম্পাদন করবে। অতএব, কাজটির জন্য প্রযোজ্য হুকুমটি জানার আগ পর্যন্ত সে অনুসন্ধান করতে থাকবে এবং জানার পর তা মেনে চলবে। একইভাবে, যদি একজন মুসলিম কোনকিছু গ্রহণ করতে বা প্রদান করতে চায়, তবে বস্তুটির জন্য প্রযোজ্য আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) প্রদত্ত হুকুম মেনে চলা তার জন্য বাধ্যতামূলক, এক্ষেত্রে বস্তুটি যে ধরনেরই হোক না কেন তা বিবেচ্য বিষয় নয়। সুতরাং তার অবশ্যই হুকুমটি অনুসন্ধান করা উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তা জানতে পারে এবং মানতে পারে। আয়াতসমূহ এবং হাদিসসমূহ থেকে প্রাপ্ত আক্ষরিক ইঙ্গিত ও উপলব্ধি হতে এই নির্দেশনাই পাওয়া যায়। অতএব, একজন মুসলিমের জন্য *শারীয়াহ্* বিধান ব্যতিত কোন কাজ করা, কিংবা কোন কাজের দিকে ধাবিত হওয়া নিষিদ্ধ। বরং, তার জন্য এটা বাধ্যতামূলক যে সে সকল কাজের ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিষয়ে শারীয়াহ্ বিধান মেনে চলবে। ***"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম" (সূরা মায়িদাহ্: ৩)***, এবং ***"আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা"*** **(সূরা নাহল: ৮৯)** - আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) কর্তৃক প্রদত্ত এই আয়াতসমূহ নাযিলের পরে এমন কোন কাজ, কিংবা বস্তু থাকতে পারে না যেটির জন্য প্রযোজ্য বিধানের বিষয়ে তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) দলিল প্রদান করেননি, এবং এই দুটি আয়াত বোঝার পরে প্রতিটি মানুষের জন্য এটি দাবি করা নিষিদ্ধ যে - কিছু কাজ, কিছু জিনিস বা কিছু পরিস্থিতি *শারীয়াহ্* বিধিবিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়; অর্থাৎ, *শারীয়াহ্* সেটাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেছে এবং এর ফলশ্রুতিতে *শারীয়াহ্* দলিল বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে, কিংবা এটির ক্ষেত্রে *শারীয়াহ্* হুকুমের উপস্থিতির বাধ্যবাধকতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের কোন ইঙ্গিত প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। ভিন্ন শব্দে বলা যায় যে, *ইল্লাহ্*'র উপস্থিতি যা ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরনীয় হুকুমটিকে নির্দেশ করে, অর্থাৎ - এটি কি *ওয়াজিব*

নাকি *মানদুব*, অথবা *হারাম* নাকি *মাকরুহ্*, কিংবা *মুবাহ্*? এই দাবি এবং এই ধরণের কোন কিছু *শারীয়াহ্*'র বিরুদ্ধে অপবাদ হিসেবে বিবেচিত হয়। অতএব, সকলের জন্য এটা দাবি করা নিষিদ্ধ যে - কোন একটি কাজ অনুমোদিত, কারণ এই কাজটির বিষয়ে কোন *শারীয়াহ্* হুকুম আসেনি এবং মূলনীতিতে আছে যে, যদি কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে *শারীয়াহ্* হুকুম উল্লেখ করা না হয় তবে তা অনুমোদিত হিসেবে বিবেচিত হবে; এবং একইভাবে, এটা বলা কারও জন্য অনুমোদিত নয় যে, এই বস্তুটি অনুমোদিত কারণ এটির বিষয়ে কোন *শারীয়াহ্* দলিল নেই। সুতরাং, যদি *শারীয়াহ্* দলিল না থাকে তবে তা মূলত অনুমোদিত হিসেবেই বিবেচিত হবে - এ ধরণের দাবি করা নিষিদ্ধ, কারণ *শারীয়াহ্*'র মধ্যে প্রতিটি কাজ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে দলিল বিদ্যমান। দলিলের উপস্থিতি নেই - এই অজুহাতে কোন কিছুকে অনুমোদিত বানানোর চেষ্টা না করে কোন কাজ করার জন্য, কিংবা কোন বস্তু গ্রহণের জন্য সেটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হুকুম অনুসন্ধান করা ও তা বাস্তবায়ন করা প্রতিটি মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক।

ইবাদতকারীর কাজের সাথে সম্পর্কিত কোন একটি *শারীয়াহ্* হুকুম যেহেতু কাজটির বিষয়ে আইনপ্রণেতার বক্তব্য, সেহেতু বক্তব্যটি এসেছে ইবাদতকারীর কাজটি সম্পাদনের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে, বস্তুর জন্য কোন হুকুম প্রদানের জন্য নয়। বরং, ইবাদতকারীর কাজের সাথে বস্তুর সংযোগকে বিবেচনা করেই আইনপ্রণেতার বক্তব্য এসেছে। অতএব, বক্তব্যটি প্রকৃতপক্ষে ইবাদতকারীর কাজের দিকে নির্দেশ করে এবং ইবাদতকারীর কাজের সাথে সম্পর্কিত হিসেবে বস্তু চলে আসে। যেমন: আল্লাহ্‌র (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বক্তব্য: ***"খাও ও পান কর"*** (বাকারাহ্: ৬০) - এটি কোন বস্তুকে উল্লেখ না করে শুধুমাত্র কাজকে নির্দেশিত করেছে। কিংবা, কোন কাজকে উল্লেখ না করে শুধু বস্তুর বিষয়ে বক্তব্য এসেছে, যেমন: আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"মৃত প্রাণীর গোশত, রক্ত এবং শুকরের মাংস তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হল"*** (মায়িদাহ্: ৩)। তদনুসারে, এই তিনটি জিনিস নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুম যা খাদ্য গ্রহণ, কেনাকাটা, বিক্রয়, ভাড়া করা এবং অন্যান্য কাজের মতো শুধুমাত্র ইবাদতকারীর কাজের সাথে সম্পর্কিত। অতএব, *শারীয়াহ্*'র হুকুম ইবাদতকারীর কাজের সাথে সম্পৃক্ত, এক্ষেত্রে হুকুমটি কাজ কিংবা বস্তু যেকোনটির জন্যই হতে পারে। যেহেতু ওহী শুধুমাত্র ইবাদতকারীর কাজের সাথে সম্পর্কিত, সেহেতু মৌলিকভাবে কাজসমূহ সুনির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে (*শারীয়াহ্* হুকুম) সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

যাহোক, *শারীয়াহ্* হুকুমের বিস্তারিত দলিলসমূহ সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা পরিষ্কার হয় যে, হুকুমের দলিল হিসেবে উৎসসমূহের যেখানে বিষয়টির প্রতি নির্দেশনা রয়েছে সেখানে বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য আসা দলিলের বক্তব্য বস্তুর জন্য আসা দলিলের বক্তব্য হতে ভিন্ন, কাজের সাথে সম্পর্কিত আয়াত ও হাদিসসমূহে শুধুমাত্র কাজের প্রতিই নির্দেশ করা হয়েছে, এবং এক্ষেত্রে বস্তুর বিষয়ে উল্লেখ আছে কি নেই তা বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"মৃত প্রাণীর গোশত, রক্ত এবং শুকরের গোশত তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হল"*** (মায়িদাহ্: ৩)।

আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"এবং আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন*** (বাকারাহ্: ২৭৫)।

এবং আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"তোমরা যুদ্ধ কর তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে"*** (সূরা তওবা: ১২৩)।

এবং আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করবে"*** (সূরা তালাক: ৭)।

এবং আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত ফিরিয়ে দেয়"*** (সূরা বাকারাহ্: ২৮৩)।

এবং আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"খাও এবং পান করা"*** (সূরা বাকারাহ্: ৬০)।

এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: ***"ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর আলাদা হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করে"*** (ইব্‌নে উমর ও অন্যান্য হতে উভয়ে একমত)

এবং তিনি (সা.) বলেছেন: ***"কর্মচারীকে তার মজুরী পরিশোধ কর"*** (ইব্নে উমর হতে ইবনে মাযা এবং আবু হুরায়রা হতে আল-বাইহাকি কর্তৃক এমন একটি সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে যা আল-বাঘাউয়ি কর্তৃক *হাসান* হিসেবে স্বীকৃত)।

উপরোক্ত সকল আয়াত ও হাদিসে কাজের প্রতি নির্দেশনা রয়েছে এবং কোন বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়নি।

এবং অন্যান্য উদাহরণে আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"তোমরা প্রত্যেকটি থেকেই টাটকা গোশত খাও" (***সূরা ফাতির: ১২)।

এবং তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"তিনিই সমুদ্রকে বশীভূত করেছেন যেন তোমরা তা থেকে টাটকা গোশত (মাছ) খেতে পার"*** (সূরা নাহল: ১৪)।

এবং তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হল মৃত জমিন, আমি তাকে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, ফলে তা থেকে তারা ভক্ষণ করে"*** (সূরা ইয়াসীন: ৩৩)।

এবং তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"নিশ্চয়ই যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে"*** (সূরা নিসা: ১০)।

এবং তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"যেন তারা এর ফলমূল থেকে ভক্ষণ করতে পারে"*** (সূরা ইয়াসীন: ৩৫)।

যদিওবা এগুলোতে বস্তুর নামসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে তথাপি উপরে উল্লেখিত প্রতিটি আয়াত ও হাদিসে কাজের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে, এবং এই আয়াত/হাদীসগুলো ইবাদতকারীর কাজের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত আয়াত ও হাদিসের মতো একইরকম।

তবে, এই বক্তব্যটি বস্তু সম্পর্কে *শারীয়াহ্* উৎসে আসা বক্তব্য হতে ভিন্ন এবং এক্ষেত্রে কাজের বিষয়ে উল্লেখ থাক বা না থাক, উভয়ের মধ্যেই বক্তব্যটি সরাসরি বিশেষভাবে বস্তুটিকে উদ্দেশ্য করে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ: আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"মৃত প্রাণীর গোশত তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে"*** (সূরা মায়িদাহ্: ৩)।

আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন: ***"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস"*** (সূরা বাকারা: ১৭৩)।

আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন: ***"আর আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি পরিমাণ মত"*** (সূরা মু'মিনুন: ১৮)।

আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন: ***"এবং প্রাণবান সবকিছু আমি সৃষ্টি করলাম পানি থেকে"*** (সূরা আম্বিয়া: ৩০)।

এছাড়াও, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সমুদ্রের পানি সম্পর্কে বলেছেন: ***"ইহার পানি বিশুদ্ধ এবং ইহার মৃত গোশত (মৎস) হালাল"*** (আবু হুরায়রাহ্ হতে মালিক এটাকে *সহীহ্* হিসেবে বর্ণনা করেছেন)

এসব আয়াত ও হাদিস্সমূহে কাজের বিষয়ে উল্লেখ না করে বস্তুর প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ: আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"ওহে যারা ঈমান এনেছ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ণায়ক শর - এসব নোংরা-অপবিত্র, শয়তানের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"*** (মায়িদাহ্: ৯০)।

আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"তোমরা যে পানি পান কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি?*** (ওয়াকি'আ: ৬৮)।

আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি?"*** (ওয়াকি'আ: ৭১)।

আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"আর খেজুর ফল ও আঙ্গুর থেকে তোমরা মাদকদ্রব্য ও উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করে থাক"*** (সূরা নাহ্ল: ৬৭)।

আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয় গৃহপালিত চতুষ্পদ পশুর মধ্যে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্যস্থল থেকে খাঁটি দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু"*** (সূরা নাহ্ল: ৬৬)।

এসকল আয়াতে বস্তুকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য এসেছে, যদিওবা কাজ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরণের বক্তব্য বস্তুর সাথে সম্পর্কিত, অতএব এটা হচ্ছে বস্তুটি সম্পর্কে একটি হুকুমের বর্ণনা। যাহোক, বস্তুর সাথে হুকুমের সম্পর্কটি যে বিষয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয় সেটা হচ্ছে - এটি ইবাদতকারীর কাজের সীমারেখাও প্রদান করে এবং বান্দার কাজ হতে বিচ্ছিন্ন করে কোন বস্তুর জন্য হুকুম আসে না। কারণ, বান্দার সাথে সম্পর্কিত না হলে এটা অসম্ভব যে, কোন একটি বস্তুর জন্য হুকুম থাকতে পারে। অতএব, উদ্দেশ্যের মধ্যকার পার্থক্য থেকে বস্তু ও কাজ সম্পর্কিত বক্তব্যের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

এই পার্থক্যটি নির্দেশ করে যে, যদিও *শারীয়াহ্* হুকুম হচ্ছে ইবাদতকারীদের কাজের বিষয়ে আইনপ্রণেতার বক্তব্য, তথাপি বস্তুসমূহের জন্য আসা নির্দিষ্ট কিছু হুকুম সেসব বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হুকুমের সীমারেখা অনির্ধারিতভাবে প্রদানের নিমিত্তে এসেছে; যদিওবা সেগুলোর জন্য প্রযোজ্য হুকুম ইবাদতকারীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পুঁঙ্খানুপুঁঙ্খভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই ইঙ্গিত আমাদের কাছে এরূপ রূপরেখা প্রদান করে যে, বস্তুর হুকুমসমূহ সাধারণ দলিলের ভিত্তিতে এসেছে, যা পর্যায়ক্রমে কাজসমূহের দলিল বর্ণনা করতে এসেছে, এবং যা সুনির্দিষ্টভাবে বস্তুর জন্য এসেছে তা বাস্তবিকভাবে সাধারণ হুকুম হতে ভিন্ন, যেটি কাজের দলিলের মাধ্যমে সেগুলোর জন্য দলিল হিসেবে এসেছে। এটা এরকম হওয়ার কারণ হল, বিস্তারিত গবেষণার মাধ্যমে বের হয়ে এসেছে যে, *শারীয়াহ্* উৎসে আসা বক্তব্যের মধ্যে যা সরাসরি কাজের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে তা সাধারণ শর্তাবলী হিসেবে এসেছে। এজন্য, এর সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল বস্তুও অনুমোদিত হবে। কারণ, কাজের জন্য আহ্বান কিংবা পছন্দের বিষয়টি সাধারণ ছিল, যা সকল বস্তুসমূহকে হালাল হিসেবে এই আহ্বানে বেষ্টন করে দিয়েছে, এবং কোন কিছু হারাম হওয়ার জন্য দলিল প্রয়োজন। আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"আর তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে জমিনে সবই"*** (জাছিয়া: ১৩); এর অর্থ হচ্ছে যে, আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আমাদের জন্য বস্তুরাজি সৃষ্টি করেছেন, এবং একারণে এগুলো আমাদের জন্য হালাল।

আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"এবং আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন"*** (বাকারাহ্: ২৭৫); এর অর্থ হচ্ছে যে, আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) সকল জিনিসের কেনা-বেচাকে হালাল করেছেন; অতএব, এসব জিনিসের/বস্তুর মধ্যে কোনটিরই কেনা-বেচার *ইবাহাহ্*'র জন্য দলিলের প্রয়োজন নেই, কারণ সাধারণ দলিলই সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়; সুতরাং, কোন কিছু বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য দলিল প্রয়োজন, যেমন: মদ।

এছাড়াও আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র বস্তু আছে তা থেকে তোমরা আহার কর"*** (বাকারাহ্: ১৬৮)। এর অর্থ হচ্ছে যে, সবকিছু ভক্ষণ করা হালাল (অনুমোদিত); অতএব, কোন নির্দিষ্ট বস্তু ভক্ষণ হালাল হওয়ার জন্য দলিলের প্রয়োজন নেই। কারণ সাধারণ দলিলই সেটাকে হালাল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কোন কিছু খাওয়ার নিষেধাজ্ঞার জন্য দলিলের উপস্থিতি আবশ্যক, যেমন: মৃত প্রাণীর গোশত।

আল্লাহ্ (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"আহার কর ও পান কর, কিন্তু অপচয় করো না"*** (সূরা আ'রাফ: ৩১)। এর অর্থ হচ্ছে, কোন কিছু পান করা হালাল; অতএব কোন একটি নির্দিষ্ট পানীয় হালাল হওয়ার জন্য দলিলের প্রয়োজন নেই। কারণ সাধারণ দলিল সেটাকে হালাল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে, নির্দিষ্ট কোন পানীয় পান নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য দলিলের প্রয়োজন, যেমন: মাদকদ্রব্য।

এগুলোর মতো একইরকমভাবে, কাজের সাথে সম্পর্কিত সবকিছু অনুমোদিত হওয়ার স্বপক্ষে সাধারণ দলিল পাওয়া যায়। যেমন: কথাবলা, হাঁটা, খেলাধুলা করা, গন্ধ নেয়া, স্বাদ নেয়া, দেখা এবং অন্যান্য কাজসমূহ যা মানুষ করে থাকে; অতএব, এগুলোর সাথে সম্পর্কিত কোন কিছু অনুমোদিত হওয়ার জন্য দলিলের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ ধরণের কাজের সাথে সম্পর্কিত কোন কিছু নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য দলিলের প্রয়োজন।

অতএব, কাজকে উদ্দেশ্য করে আসা প্রাপ্ত দলিলসমূহ বস্তুসমূহের হুকুমের রূপরেখা সাধারণ ও অনির্দিষ্টভাবে প্রদান করেছে; তাই তাদের হুকুমসমূহের জন্য অন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নেই। অতএব, যখন এসব বস্তুসমূহের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ হুকুমের রূপরেখা তৈরী হয়ে যায় তখন বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট কোন ওহী দলিল হিসেবে নির্দেশ করে যে, এসব বস্তুর জন্য প্রযোজ্য সুনির্দিষ্ট হুকুমসমূহ সাধারন হুকুম হতে ভিন্ন। তদনুসারে, বস্তুসমূহের জন্য প্রযোজ্য *শারীয়াহ্* হুকুমের রূপরেখা প্রদানের উদ্দেশ্যে *শারীয়াহ্* উৎসসমূহ এসেছে এবং তা নির্দেশ করে যে তারা অনুমোদিত; অতএব বস্তুসমূহ অনুমোদিত, যদি না সেগুলোকে নিষিদ্ধকারী কোন *শারীয়াহ্* দলিলের উপস্থিতি বিদ্যমান থাকে। এ প্রক্রিয়াতেই *শারীয়াহ্* মূলনীতি -*"বস্তুসমূহের প্রকৃতি হচ্ছে ইবাহাহ্"*-এর উদ্ভব হয়েছে। এই ধারাটির স্বপক্ষে এগুলো হচ্ছে দলিল।

ধারা ১৫

যদি কোন মাধ্যম হারাম কাজের দিকে ধাবিত করে, কিংবা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষকে হারামের দিকে নিয়ে যায়, তবে তা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি কোন একটি মাধ্যমের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সন্দেহ/আশংকা থাকে যে তা হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে তবে উক্ত মাধ্যমটি নিষিদ্ধ হবে না।

আল্লাহ্‌র (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) বক্তব্যে এই ধারাটির স্বপক্ষে দলিল পাওয়া যায় - ***"আর তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের পূজা করে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না, কেননা তাহলে তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্‌কে গালি দেবে"*** (সূরা আন'আম: ১০৮)। অবিশ্বাসীদেরকে অপমান করা অনুমোদিত এবং আল্লাহ্‌ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) তাদেরকে কুর'আনে অপমান করেছেন। যাহোক, অপমান করার ফলে যদি অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌কে (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) অসম্মানিত করার দিকে ধাবিত হয় তবে তাদেরকে অপমান করা নিষিদ্ধ হবে। এর কারণ হল, আল্লাহ্‌কে (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) অসম্মানিত করা অনুমোদিত নয় এবং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; এটা থেকেই *শারীয়াহ্‌* মূলনীতি - *"যা হারামের দিকে ধাবিত করে তা নিষিদ্ধ"* - উদ্ভুত হয়েছে। যাহোক, যদি এরকম প্রবল সম্ভবনা থাকে যে, কোন কিছু হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে তবে তাও হারাম। অবিশ্বাসীদের মূর্তিদেরকে অপমান করা নিষিদ্ধ, কারণ এটা আল্লাহ্‌কে (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) অসম্মানিত করার দিকে ধাবিত করতে পারে; যেরকমভাবে আয়াতটিতে কার্যকারণ হিসেবে "ফা" (যদি ঘটে তাই) অক্ষরটি ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে। এবং, যদি তাদের মূর্তিদেরকে অপমান করার ফলে আল্লাহ্‌কে (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) অসম্মানিত করার জোরালো সম্ভাবনা না থাকত, যেরকমভাবে কোন *শারীয়াহ্‌* হুকুমে কোন কিছু ঘটার জোরালো সম্ভাবনা (ঘালাবাত্‌ আল্‌-ধান) বিদ্যমান থাকার প্রয়োজন, তবে কার্যকারনের প্রতি নির্দেশক "ফা" অক্ষরটি নিষিদ্ধতাকে ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহৃত হতো না। অতএব, যদি কোন বিষয়ের দ্বারা হারামের দিকে ধাবিত হওয়ার জোরালো সম্ভবনা না থাকে, বরং কেবলমাত্র কিঞ্চিত সম্ভবনা থাকে যে তা হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে তবে এক্ষেত্রে তা হারাম বলে বিবেচিত হবে না, যেমন: একজন মহিলা মুখমন্ডল আবৃত না করে বাহিরে বের হতে পারে - যা ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে বলে আশংকা থাকে; এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আশংকা/ভীতির উপস্থিতি নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য যথেষ্ট নয়। এসব কিছুর উপরে, কেবলমাত্র ফিতনা সৃষ্টির আশংকা থাকার কারণে মহিলার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবে না। এটাই এই ধারার দলিল।

এই মুলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরেকটি মূলনীতি হচ্ছে - *"মুবাহ্‌ জিনিসের অন্তর্গত কোন বস্তু যদি ক্ষতির দিকে ধাবিত করে তবে সেই নির্দিষ্ট বস্তুটি হারাম হয়ে যায় এবং মুবাহ্‌ জিনিসটি মুবাহ্‌'ই থাকে"*। যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) আল-হিজর অঞ্চল অতিক্রম করেছিলেন এবং তখন অন্যান্যরা সেখানকার ঝরনা থেকে পানি সংগ্রহ করেছিল - এই বর্ণনায় এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যখন তারা স্থান ত্যাগ করেছিল তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছিলেন: ***"এখানকার পানি হতে কোন কিছু পান করো না এবং এটি সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে ব্যবহার করো না। তোমরা যে ময়দার খামির বানিয়েছ তা পশুদের দিয়ে দাও এবং সেখান থেকে কোন কিছু ভক্ষণ করো না। রাতের বেলা তোমাদের কারও বাহিরে বের হওয়া সমীচিন নয়, যদি না সাথে একজন সঙ্গী থাকে"*** (ইবনে হিশাম-এর *সীরাহ্‌* এবং ইবনে হিব্বান-এর *আল-থিকাত*'এ বর্ণিত)। পানি পান করা অনুমোদিত, কিন্তু সেই নির্দিষ্ট পানি - যা সামুদ গোত্রের পানি, রাসূল (সা.) নিষিদ্ধ করেছেন, কারণ সেটা ক্ষতিকর; যদিওবা, সাধারণভাবে পানি হালাল। এছাড়াও, একজন মানুষের জন্য সঙ্গী ব্যতিরেকে একাকী রাতে বাহিরে বের হওয়া অনুমোদিত, কিন্তু রাসূল (সা.) সেই বিশেষ রাতে ও বিশেষ স্থানে তার বাহিনীর কাউকে একাকী বাহিরে বের হওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন, কারণ তা ক্ষতির দিকে ধাবিত করবে। এটা ব্যতিরেকে রাতের বেলা একাকী বাহিরে বের হওয়ার অনুমোদন বজায় আছে। এই বর্ণনাটি এ বিষয়ের দলিল হিসেবে কাজ করে যে, একটি হালাল জিনিসের অন্তর্গত কোন নির্দিষ্ট বস্তু হারাম হয়ে যায় - যদি তা ক্ষতির দিকে ধাবিত করে, যদিওবা সাধারণভাবে জিনিসটি অনুমোদিতই থাকে।

শাসনব্যবস্থা

ধারা ১৬

শাসনব্যবস্থা হচ্ছে একক-ভিত্তিক, যুক্তরাষ্ট্রীয় নয়।

শাসনের জন্য একমাত্র সঠিক ব্যবস্থা হচ্ছে একক-ভিত্তিক ব্যবস্থা এবং এটা ছাড়া অন্য কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। এর কারণ হলো, *শারী'য়াহ্* দলিল শুধুমাত্র এটিকেই নিয়ে এসেছে এবং বাকি সবকিছুকে নিষিদ্ধ করেছে; আবদুল্লাহ্ বিন আমরু বিন আল-আস্ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্'কে (সা.) বলতে শুনেছেন: ***"যে কেউ একজন ইমামকে নিজের দৃঢ়মুষ্ঠিতে এবং আকুণ্ঠচিত্তে আনুগত্যের বাই'আত প্রদান করে এবং অতঃপর আরেকজন ব্যক্তি সেই ইমামের সাথে নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তবে দ্বিতীয় জনের গর্দান নিয়ে নাও"*** (মুসলিম)। এবং আবু সাঈদ আল-খুদরী হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: ***"যদি আনুগত্যের বাই'আত দুই জন খলিফাকে দেয়া হয় তবে তাদের মধ্যে দ্বিতীয় জনকে হত্যা কর"*** (মুসলিম)। এ দুটি বর্ণনা হতে হুকুম উদ্ভূত হওয়ার যে দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় তা হলো: প্রথম বর্ণনাটি ব্যাখ্যা করে যে ইমামত, ভিন্ন শব্দে খিলাফত কোন একজন যোগ্য ব্যক্তিকে প্রদান করা হলে তাকে মান্য করা বাধ্যতামূলক এবং যদি এর পরে কেউ খলিফার সাথে দ্বন্দ্ব করতে আসে তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তাকে হত্যা করা বাধ্যতামূলক, যদিনা সে তার দাবি পরিত্যাগ করে। সুতরাং, এই বর্ণনা এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয় যে, খিলাফতের মধ্যে কেউ যদি খলিফার নেতৃত্বের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তবে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করতে হবে। এবং এটি হচ্ছে এমন একটি ইঙ্গিত যা রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির নিষেধাজ্ঞার প্রতি নির্দেশ করে, বিভক্তিকে অনুমোদন না দেয়াকে উৎসাহ দেয় এবং রাষ্ট্র হতে যে কোন ধরনের বিচ্ছিন্নতাকে নিষিদ্ধ করে। এমনকি রাষ্ট্রের অখন্ডতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগেরও অনুমোদন দেয়। আর দ্বিতীয় বর্ণনাটির প্রেক্ষিতে বলা যায় যে: এটা হচ্ছে ঐ অবস্থা যখন রাষ্ট্রের কোন প্রধান না থাকে, ভিন্ন শব্দে খলিফা না থাকে এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্ব, ভিন্ন শব্দে খিলাফত যদি দুজন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, তবে তাদের মধ্য হতে দ্বিতীয় জনকে হত্যা করতে হবে এবং বৃহত্তর যুক্তিবিচারে যদি তা দুই-এর অধিক ব্যক্তিকে দেয়া হয় তবে বাকিদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। এবং এটা হচ্ছে এমন একটা ইঙ্গিত যা রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্তির নিষিদ্ধতার প্রতি নির্দেশ করে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রকে খন্ডিত করে একাধিক রাষ্ট্রে পরিণত করা নিষিদ্ধ এবং কেবলমাত্র একটি রাষ্ট্র থাকা বাধ্যতামূলক। অতএব, ইসলামের শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে একক-ভিত্তিক, যুক্তরাষ্ট্রীয় নয় এবং এই একক ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য যেকোন ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ; এবং এ কারনেই এই ধারাটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ধারা ১৭

শাসন কেন্দ্রীয় এবং প্রশাসন বিকেন্দ্রীয়

শাসন ও প্রশাসনকে আলাদা করার লক্ষ্যে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। দুটি দৃষ্টিকোন থেকে এদুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে যায়: এদের প্রতিটির বাস্তবতা হতে এবং প্রাদেশিক শাসক (*ওয়ালী*) ও সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ হতে। এগুলোর প্রতিটির বাস্তবতার ক্ষেত্রে বিধান (*হুকুম*), ক্ষমতা (*মুল্‌ক*) এবং শাসক (*সুলতান*) একই অর্থ বহন করে এবং শাসক আইনসমূহ বাস্তবায়ন করে। *আল-মুহিত* অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে: "*.....আল-মুল্‌ক* হচ্ছে মাহাত্ম্য ও *সুলতান*", এবং অন্য এক জায়গায় এসেছে যে: "*আল-সুলতান* হচ্ছে *মুল্‌ক*-এর সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং সামর্থ্য", এবং তৃতীয় আরেকটি স্থানে এসেছে যে: "*আল-হুকুম*: অধ্যাদেশ.... এবং *আল-হাকিম* হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে *হুকুম* বাস্তবায়ন করে", এবং ভাষাগত দিক দিয়ে এর অর্থ হল *হুকুম*, মানে আদেশ বা ফরমান এবং *হাকিম* (শাসক) অর্থ হল হুকুম বাস্তবায়নকারী, এবং এই ধারাটিতে *হুকুম* শব্দটি দ্বারা এর পারিভাষিক অর্থ 'আইন বাস্তবায়ন'-এর প্রতি নির্দেশ করা হচ্ছে:, ভিন্ন শব্দে বলা যেতে পারে যে ক্ষমতা, শাসক এবং শাসনের সামর্থ্যের প্রতি নির্দেশ করা হচ্ছে। কিংবা, আরেকটি বর্ণনা অনুসারে এটা হচ্ছে নেতৃত্বের কার্যাবলী, যা মুসলিমদের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী শারী'য়াহ্ কর্তৃক বাধ্য করা হয়েছে: ***"তিনজন ব্যক্তির জন্য এটা অনুমোদিত নয় যে তারা পৃথিবীতে উন্মুক্ত স্থানে নিজেদের মধ্য হতে একজনকে আমির নিযুক্ত করা ব্যতিরেকে একসাথে অবস্থান করবে",*** আব্দুল্লাহ্ বিন 'আমরু হতে আহ্‌মদ এটি বর্ণনা করেছেন, এবং নেতৃত্বের কাজ হচ্ছে সেই কর্তৃত্ব যা অবিচার প্রতিরোধ এবং বিবাদ মিমাংসায় ব্যবহৃত হয়, কিংবা ভিন্নভাবে বলা যায় যে, *হুকুম* হচ্ছে শাসকের তত্ত্বাবধান যা আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বাণীতে এসেছে: ***"তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ফয়সালার অধিকারী"*** (সূরা নিসা: ৫৯), এবং তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বাণীতে আসা শব্দসমূহে: ***"যদি তারা তা সোপর্দ করত রাসূলের কাছে কিংবা তাদের মধ্যে যারা ফায়সালার অধিকারী তাদের কাছে"*** (সূরা নিসা: ৮৩), এই আয়াতসমূহে বিভিন্ন বিষয়াদি কার্যকরীভাবে দেখাশোনা করার দায়িত্বের বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে। এটাই হচ্ছে হুকুমের বাস্তবতা। এটার ভিত্তিতে শাসকের তত্ত্বাবধান, নেতৃত্ব এবং ক্ষমতা হচ্ছে শাসনের অংশ এবং অন্যসবকিছু হচ্ছে প্রশাসনের অংশ; অতএব, খলিফা এবং নেতৃবৃন্দের মধ্য হতে গভর্ণর ও আ'মীলগণ শারী'য়াহ্ হুকুম ও আইনী রায়সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের বিষয়াদি দেখাশোনার কাজে যা করে তা শাসনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়; এগুলো ব্যতিরেকে তারা, কিংবা জনগণ বা খলিফা কর্তৃক নিয়োগকৃত অন্যান্য ব্যক্তিরা যা করে তা প্রশাসনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। তদনুসারে শাসন ও প্রশাসনের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

শারী'য়াহ্ উম্মাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত খলিফা বা উম্মাহ্ কর্তৃক পছন্দকৃত আমির থাকার বিধান প্রদান করেছে। অতএব, উম্মাহ্'র পছন্দের আমির কিংবা উম্মাহ্‌র বাইয়াহ্'র মাধ্যমে নির্বাচিত খলিফাই হলেন সেই ব্যক্তি যার শাসন করার অধিকার রয়েছে; কিংবা বলা যায়, শাসন করার কাজ হচ্ছে খলিফা বা আমিরের, অন্য কেউই শাসন করতে পারে না, যদিনা খলিফা কাউকে এর দায়িত্ব প্রদান করে থাকেন, এবং এভাবেই শাসন হচ্ছে কেন্দ্রীয়। ভিন্ন শব্দে বলা যায়, উম্মাহ্‌র দায়িত্ব হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে অর্থাৎ খলিফা বা আমিরকে শাসন ক্ষমতা প্রদান করা; এবং আনুগত্যের বাই'য়াহ্, কিংবা মনোনয়ন বা নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি শাসন করার অধিকার লাভ করেন, এবং তখন তিনি তার পছন্দ অনুযায়ী কাউকে শাসনের ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন, এবং অন্য কারও শাসন করার অধিকার নেই, যদিনা তিনি কাউকে শাসনের ক্ষমতা প্রদান করেন। তদনুসারে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেন্দ্রীয় শাসনের অর্থ হচ্ছে উম্মাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত একজনমাত্র ব্যক্তির উপর শাসনের অধিকার সীমাবদ্ধ করে দেয়া, যেখানে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই শাসনের অধিকার লাভ করেন। অন্য কেউই স্বয়ংক্রিয়ভাবে শাসনের অধিকার লাভ করতে পারে না; বরং, তারা তা পেতে পারে অন্য কারও অনুমোদন সাপেক্ষে, এবং তাদের শাসনের ব্যপ্তিকাল প্রদত্ত অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট সময়, স্থান ও অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে; এবং এভাবেই শাসনের বাস্তবতা নির্দেশ করে যে, এটি কেন্দ্রীয় এবং এটির কেন্দ্রীয়করণ করা আবশ্যক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপে দেখা যায় যে, তিনি (সা.) প্রদেশসমূহে গভর্ণর পাঠতেন এবং তাদেরকে জনগণের উপর শারী'য়াহ্ হুকুম বাস্তবায়নের আদেশ দিতেন। এছাড়াও তিনি (সা.) সরকারী কর্মচারী নিয়োগ দিতেন যাতে করে শাসনকার্য পরিচালনা বা আইন বাস্তবায়ন ব্যতিত অন্যান্য কাজ তারা সমাধা করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, তিনি (সা.) গভর্ণরদের নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে শাসনকার্য পরিচালনা বা আইন বাস্তবায়নের অধিকার দিয়েছিলেন; এবং এক্ষেত্রে তিনি (সা.) শাসনকার্য পরিচালনার উপায় ও ধরণ সুনির্দিষ্ট করে দেননি, বরং

তাদের উপর তা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাদের মধ্য হতে কয়েকজনকে তিনি (সা.) শারী'য়াহ্ হুকুম সম্বলিত চিঠি প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়নের উপায় ও ধরণ উল্লেখ করেননি এবং অন্যদেরকে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) প্রদত্ত শারী'য়াহ্ বাস্তবায়নের আদেশ দেয়া হয়েছিল। তিনি (সা.) আমরু বিন হাযারকে গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন ও তাকে চিঠি দিয়েছিলেন, এবং তিনি (সা.) মুয়ায্ বিন জাবালকে নিয়োগ দিয়েছিলেন ও তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তিনি কিভাবে শাসন করবেন এবং এরপর তিনি (সা.) তার দৃষ্টিভঙ্গির শুদ্ধতাকে নিশ্চিত করেছিলেন। এছাড়াও, তিনি (সা.) 'ইসাব বিন উসাইদকে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) প্রদত্ত শারী'য়াহ্ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং তিনি (সা.) দায়িত্ব পালনের যোগ্যতার নিরিখে বিভিন্ন ব্যক্তিকে গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এটা বর্ণিত আছে যে, "***'ইমরান বিন হুসেইনকে দানের অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং যখন তিনি ফিরে আসলেন তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: "দানের অর্থ কোথায়?"। তিনি উত্তরে বলেছিলেন: "আপনি আমাকে অর্থের জন্য পাঠিয়েছিলেন!? রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়ে আমরা যাদের কাছ থেকে দান সংগ্রহ করা উচিত তাদের কাছ থেকে নিতাম এবং যাদেরকে দেয়া উচিত তাদেরকে দিয়ে দিতাম"*** (ইবনে মাযা কর্তৃক বর্ণিত ও আল-হাকিম কর্তৃক সত্যায়িত)।

বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন, কারণ তাদের দায়িত্ব সীমিত এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় সেটা অনুযায়ী তারা কাজ করে। উদারহরণস্বরূপ: রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাকে বংঃরসধঃড়ৎ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন, যিনি ইহুদীদের জন্য বংঃরসধঃব করে দিতেন; ভিন্ন শব্দে বলা যায় যে, তিনি ফসল কাটার পূর্বে ফসলের ফলনের পরিমান বংঃরসধঃব করতেন। যাবির বিন আব্দুল্লাহ্ হতে সহীহ্ সনদ সহকারে আহ্মদ কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: ***"আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) খায়বারকে যুদ্ধলব্ধ মালামাল হিসেবে রাসূলুল্লাহ্কে (সা.) প্রদান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের পূর্বের অবস্থা বহাল রাখার অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং এটিকে তাদের মধ্যকার একটি চুক্তি হিসেবে স্থির করে দিয়েছিলেন এবং তিনি (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাকে পাঠিয়েছিলেন যিনি শস্য পরিমাপ করতে পারতেন; আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা তাদেরকে বলেছিলেন: হে ইহুদীদের জমায়েত, তোমরা আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃনিত মানুষ, তোমরা আল্লাহ্র নবীদের হত্যা করেছিলে এবং তোমরা আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করেছিলে, কিন্তু এই ঘৃণা আমাকে তোমাদের প্রতি কোন অবিচার করার দিকে ধাবিত করবে না। আমি বিশ হাজার খেজুর পরিমাপ করেছি, সুতরাং যদি তোমরা চাও তবে এগুলো তোমাদের জন্য এবং যদি তোমরা না চাও তবে এগুলো আমার। আর তারা বলেছিল যে: এটাই তো আসমান ও জমিনের ফয়সালা যে এগুলো আমাদের কাছেই থাকবে; কাজেই এগুলো আমরা গ্রহণ করছি এবং আমাদেরকে ছেড়ে দাও"***। তিনি (সা.) যাকাত আদায়কারী প্রেরণ করতেন, যারা যাকাত সংগ্রহ করত এবং তাঁর (সা.) কাছে পৌছে দিত; এবং তিনি (সা.) তাদেরকে মজুরী প্রদান করতেন, বিশ্র বিন সাঈদ বিন আল-সাদি আল-মালিকি এরূপ বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন যে: ***"উমর আমাকে ফসল আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন, সুতরাং আমি যখন তা আদায় সম্পূর্ণ করেছিলাম ও তার কাছে প্রদান করেছিলাম তখন তিনি আমাকে মজুরী নেয়ার আদেশ প্রদান করেছিলেন। তখন আমি বলেছিলাম, "আমি এটা শুধুমাত্র আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলার) জন্য করেছি। তিনি উত্তরে বলেছিলেন: "আমি আপনাকে যা দিচ্ছি তা গ্রহণ করুন, কারণ আপনি যা করেছেন রাসূলুল্লাহ্র (সা.) সময়ে আমি তা করেছিলাম এবং আমিও আপনার মতো একই কথা বলেছিলাম, কিন্তু তিনি (সা.) আমাকে বলেছিলেন, "যদি জিজ্ঞাসা না করে তোমাকে কোন কিছু দেয়া হয় তবে তা গ্রহণ কর এবং দান করে দাও"*** (মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

সুতরাং, শাসক যখন 'ইমরান বিন হুসাইন কর্তৃক সংগৃহিত যাকাত তার কাছে জমা দিতে বললেন তখন তিনি তা দিতে পারেননি, কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক যাকাত আদায়ের দায়িত্বে নিযুক্ত হলে যেভাবে তিনি আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া ত'আলা) আইন বাস্তবায়ন করতেন এবং যাদের পাওয়ার অধিকার রয়েছে তাদেরকে যাকাত দিতেন সেভাবে তিনি এক্ষেত্রেও একইরকমভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু, বিশর বিন সাঈদ রাষ্ট্রের একজন কর্মচারী ছিলেন, যিনি কেবল যাকাত আদায় করার মাধ্যমে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছিলেন, কিন্তু শারী'য়াহ্ হুকুম বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেননি। এভাবেই শাসক ও সরকারী কর্মচারীর কাজের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা পরিষ্কার করা হয়েছে, সুতরাং শাসকের কাজ হচ্ছে শারী'য়াহ্ বাস্তবায়ন করা। ভিন্ন শব্দে বলা যায়: শাসন, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব; এবং সরকারী কর্মচারীদের কাজ হচ্ছে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা, আইন বাস্তবায়ন করা নয়; সুতরাং তারা শাসন ক্ষমতার অংশ নয় বরং তারা কেবলমাত্র প্রশাসনের অংশ।

এছাড়াও, শাসকের নিজস্ব কাজগুলোর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। কারণ, কাজগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে শাসন, যার অর্থ হচ্ছে শারী'য়াহ্ হুকুম বাস্তবায়ন এবং রায় বাস্তবায়ন; আর কেবলমাত্র যে ব্যক্তিকে পদমর্যাদা অনুযায়ী শাসনের অধিকার সহকারে নিয়োগ দেয়া হয়, সেই ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কারও শাসন সম্বন্ধীয় কার্যাবলী পালনের অধিকার নেই। এবং, শাসকের কাজসমূহের মধ্যে বিভিন্ন ধরণ ও মাধ্যম রয়েছে যেগুলো

আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, আর এগুলো হচ্ছে প্রশাসনের অংশ। এগুলো শাসকের জন্য সুনির্দিষ্ট করে দেয়ার প্রয়োজন নেই এবং যারা তাকে নিয়োগ দিয়েছে তাদের কাছে এগুলো বিবেচনার জন্য প্রেরন করা আবশ্যক নয়। বরং, শাসক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তি তাকে এই অধিকার প্রদান করে যে, তিনি তার বিবেচনা অনুযায়ী মাধ্যম/উপায় এবং ধরণ ব্যবহার করতে পারবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না যারা তাকে নিয়োগ দিয়েছে তারা তার জন্য সুনির্দিষ্ট ধরণ ও মাধ্যম নির্ধারণ করে দেয়, সেক্ষেত্রে তিনি তার জন্য নির্ধারিত বিষয়সমূহ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। ভিন্ন শব্দে বলা যায় যে, শাসক হিসেবে তার নিয়োগ তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করার অধিকার প্রদান করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শাসনের অধিকার প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে তার জন্য কোন ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া না হয়, আর এটা করা হলে তাকে নির্ধারিত ব্যবস্থাসমূহ মেনে চলতে হবে।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, কেন্দ্রীয় শাসনের অর্থ হল শাসনকার্য নির্বাহ করা; ভিন্ন শব্দে বলা যায় যে শারী'য়াহ্ বাস্তবায়ন করা, এবং শাসনের এই কর্তৃত্ব কেউই পেতে পারে না, যদিনা উম্মাহ্ তাকে এই কর্তৃত্ব প্রদান করে, আর একারনেই এই কর্তৃত্ব শুধুমাত্র তার জন্যই প্রযোজ্য ও তিনি যাকে এই দায়িত্ব অর্পন করবেন সে তা নির্বাহ করে। বিকেন্দ্রীয় প্রশাসনের অর্থ হচ্ছে যে, শাসককে যারা নিয়োগ প্রদান করে তাদের কাছে প্রশাসনিক বিষয়াদি অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করার কোন প্রয়োজন নেই, বরং তিনি সেগুলো তার মতামত অনুযায়ী নির্বাহ করেন। শারী'য়াহ্ উৎসে উল্লেখিত শাসনের বাস্তবতা হতে এবং শাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদিস হতে এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই হচ্ছে এই ধারাটির স্বপক্ষে দলিল।

ধারা ১৮

শাসক চার ধরনের: খলিফা, প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী, গভর্ণর এবং 'আমিল, এবং যে ব্যক্তির উপর একই হুকুম প্রযোজ্য হয়। অন্য কোন ব্যক্তিই শাসক হিসেবে বিবেচিত হবে না, বরং তারা হচ্ছে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্মচারী।

এই ধারাটিতে একজন শাসক হচ্ছেন সেই কর্তৃত্ববান ব্যক্তি যিনি বিভিন্ন বিষয়াদি দেখাশোনার বিষয়ে দায়িত্বশীল, এক্ষেত্রে তা সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য নাকি একটি নির্দিষ্ট অংশের জন্য সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। শারী'য়াহ্ হতে উদ্ভুত হুকুম অনুযায়ী যেসব ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়াদি দেখাশোনা ও আইন বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল এবং যাদের দ্বারা বাস্তবায়িত আইনসমূহ মেনে চলা বাধ্যতামূলক তারা হচ্ছে এই চার: খলিফা, প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী, গভর্নর এবং 'আমিল; এবং শাসক হিসেবে পদমর্যাদার কারনে তাদেরকে মান্য করতে হবে।

খলিফার ক্ষেত্রে: তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যাকে উম্মাহ্ (মুসলিম জাতি) বাই'য়াত প্রদান করেছে, যাতে তিনি তাদের প্রতিনিধি হিসেবে দ্বীন (ধর্ম) বাস্তবায়ন করেন। অতএব, তিনি হুদুদ বাস্তবায়ন করেন, আইন-কানুন বাস্তবায়ন করেন, জিহাদ পরিচালনা করেন এবং আনুগত্য অর্জন করেন, ***"যে ব্যক্তি দৃঢ়মুষ্ঠিতে আন্তরিকতার সহিত আনুগত্যের বাই'য়াত প্রদান করে, তার উচিত তাকে মান্য করা এবং যদি অন্য কেউ তার সাথে বিতর্ক (শাসনের বিষয়ে) করতে আসে তবে পরবর্তী ব্যক্তির গর্দানে আঘাত হানো"*** (আব্দুল্লাহ্ বিন আমরু বিন আল-আস হতে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর ক্ষেত্রে: তিনি হচ্ছেন সহকারী, যিনি খলিফাকে বিভিন্ন বিষয়াদি তত্ত্বাবধানের কাজে সহায়তা করেন; ভিন্ন ভাবে বলা যায় যে, শাসনকার্যের সাধারণ ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদিতে নিরন্তর সহযোগিতা করেন। এর স্বপক্ষে দলিল হচ্ছে যে, তিনি শাসনের এমন একটি পদে অধিষ্ঠিত থাকেন যার কারনে যেসব বিষয়ে খলিফা তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, কিংবা দেখাশোনার কাজে তাকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন সেসব বিষয়ে তাকে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। আয়শা (রা.) হতে একটি সহীহ্ সনদ সহকারে আহ্মাদ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন: ***"মুসলিমদের দেখাশোনার কাজে যেকোন বিষয়ে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) যদি কাউকে দায়িত্বশীল বানান এবং তার কাছ থেকে উত্তম কিছু আশা করেন, তবে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাকে একজন সৎ সহকারী (প্রতিনিধিত্বকারী) প্রদান করেন, উদাহরনস্বরূপ: যদি তিনি কোন কিছু ভুলে যান তবে সে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেবে এবং যদি তিনি মনে রাখতে পারেন তবে সে সেটা পালনে তাকে সাহায্য করবে।"***

গভর্ণরের ক্ষেত্রে: তিনি হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যাকে খলিফা রাষ্ট্রের কোন একটি প্রদেশের দায়িত্ব প্রদান করেন। আউফ বিন মালিক আল-আশজাঈ হতে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস হতে এর স্বপক্ষে দলিল পাওয়া যায়, তিনি শাসনের এমন একটি পদ অধিকার করেন যার কারনে তাকে অবশ্যই মান্য করতে হবে। আউফ বিন মালিক আল-আশজাঈ বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্কে (সা.) বলতে শুনেছেন: ***"..... যার উপরে একজন গভর্ণর নিযুক্ত রয়েছে এবং যদি সে দেখে যে গভর্ণর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোন গুনাহ্র কাজ করছে তবে তার উচিত কাজটিকে গুনাহ্ হিসেবে ঘৃণা করা, কিন্তু তাকে আনুগত্য করা থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়"***। মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি হাদিসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: ***"যদি তোমার গভর্ণরদের মধ্যে তুমি এমন কিছু প্রত্যক্ষ কর যা তুমি ঘৃণা কর তবে তার সেই কাজকে ঘৃণা কর এবং তার আনুগত্য করা হতে বিচ্যুত হয়ো না"***।

'আমিলের ক্ষেত্রে: তিনি হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যাকে খলিফা একটি গ্রাম, শহর কিংবা একটি প্রদেশের কিছু অংশের দায়িত্ব প্রদান করেন, কিংবা তার প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেন। 'আমিলের কাজের প্রকৃতি গভর্ণনের মতোই, তবে এক্ষেত্রে পার্থক্য হচ্ছে যে, তিনি একটি প্রদেশের কোন একটি অংশের শাসনকার্যের দায়িত্বে থাকেন, সমগ্র প্রদেশের দায়িত্বে নয়। এবং তদনুসারে তিনি একজন শাসক, যাকে অবশ্যই গভর্ণরের মতোই মান্য করতে হবে। কারণ, তিনি হচ্ছেন এমন একজন নেতা যাকে খলিফা কিংবা গভর্ণর নিযুক্ত করে থাকেন। আনাস বিন মালিক হতে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আনাস বিন মালিক) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, ***"যদি তোমাদের উপরে একজন কৃষ্ণকায় কৃতদাসকেও শাসনের দায়িত্ব দেয়া হয় যার হাত কিসমিসের মতো, তাকে শোনো ও মান্য কর"***। উম্মুল হুসাইন হতে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্'কে (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছেন: ***"যদি তোমাদের উপর কোন কৃতদাসকে নিযুক্ত করা হয় যে আল্লাহ্'র বিধান অনুযায়ী শাসন করে, তবে তার কথা শোনো ও তাকে মান্য কর।"***

“এবং যে ব্যক্তিই এই আইনের আওতায় পড়বেন” - বক্তব্যটির ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এর অর্থ হল মাযালিম বিচারক এবং কাজীদের কাজী যদি তাকে মাযালিম বিচারক নিয়োগ করার ও অপসারণ করার অধিকার প্রদান করা হয় এবং এর সাথে সাথে তাকে মাযালিম বিচারকদের ক্ষমতা দেয়া হয়, কারণ ‘ধারা ৭৮’-এর বিষয়বস্তু অনুসারে মাযালিম বিচারকের পদটি শাসনের অন্তর্ভুক্ত।

ধারা ১৯

শাসনের দায়িত্ব গ্রহন করা কিংবা শাসনকার্যের অন্তর্ভুক্ত কোন কাজ করা কারও জন্য অনুমোদিত নয়; যদিনা তারা পুরুষ, মুক্ত, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক, ন্যায়পরায়ন এবং দায়িত্ব পালনের যোগ্য হয়; এবং মুসলিম ব্যতিত অন্য কারও জন্যও এটা অনুমোদিত নয়।

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) একজন অবিশ্বাসীকে মুসলিমদের উপর শাসক হিসেবে নিযুক্ত করাকে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"আল্লাহ্ কখনও কাফেরদের জন্য মু'মিনদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখবেন না"*** (সূরা নিসা: ১৪১), এবং একজন অবিশ্বাসীকে মুসলিমদের শাসক বানানোর অর্থ হচ্ছে তাকে মুসলিমদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করা, আর আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) 'কখনও না' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে এটাকে সুনির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যা মুসলিমদের উপর কোন অবিশ্বাসীকে কর্তৃত্ব প্রদানের নিষিদ্ধতার প্রতি নির্দেশ করে; ভিন্ন শব্দে বলা যায় যে, অবিশ্বাসীকে মুসলিমদের শাসক হিসেবে নিযুক্ত করার নিষেধাজ্ঞার প্রতি নির্দেশ করে। এটা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ এবং এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে এটাকে হারাম করা হয়েছে। এছাড়াও, আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এটাকে শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, তালাকের পরে একজন ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"অতঃপর যখন তারা ইদ্দত শেষ করার নিকটবর্তী হয়, তখন তোমরা তাদেরকে যথারীতি বিবাহবন্ধনে থাকতে দিবে। অথবা যথারীতি তাদেরকে ইদ্দত শেষে মুক্ত করে দিবে। আর তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়বান লোককে সাক্ষী রাখবে"*** (সূরা তালাক: ২), এবং এ থেকে যা বোঝা যায় তা হচ্ছে, মুসলিম ব্যতিত অন্য কারও কাছ থেকে সাক্ষ্য নেয়া যাবে না। এছাড়াও, ঋণের ক্ষেত্রেও সাক্ষী মুসলিম হতে হবে; আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"তোমাদের নিজেদের মধ্যকার পুরুষ হতে দু'জন সাক্ষী রাখবে"*** (সূরা বাকারাহ্: ২৮২); ভিন্ন শব্দে বলা যায় যে, তোমাদের মধ্যকার পুরুষ ভিন্ন অন্য কারও কাছ থেকে নয়। সুতরাং, এই দুই ক্ষেত্রে যদি সাক্ষী হওয়ার জন্য কোন একটি শর্ত প্রযোজ্য হয় তবে তা হচ্ছে, তাদেরকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। অতএব, বৃহত্তর যুক্তিতে শাসক হিসেবে অবশ্যই মুসলিম হওয়াও একটা শর্ত। এছাড়াও, শাসন হচ্ছে শারী'য়াহ্ হুকুম এবং বিচারকের রায় বাস্তবায়ন, এবং শারী'য়াহ্ অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনার জন্য তাদেরকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং, তদনুসারে এটা একটা শর্ত যে তাদেরকে মুসলিম হতে হবে। যাদেরকে শাসনের কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে তারাই শাসক, এবং যখন আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদের প্রতি আনুগত্যের আদেশ দেন এবং নিরাপত্তা ও ভীতির বিষয়াদিতে তাদের কাছে সমাধান চওয়া হয়, তখন এটা শর্ত হিসেবে প্রযোজ্য হয় যে, যাদেরকে কর্তৃত্ব দেয়া হবে তাদেরকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে; আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ফয়সালার অধিকারী"*** (সূরা নিসা: ৫৯), এবং ***"যখন তাদের কাছে নিরাপত্তা কিংবা ভয় সংক্রান্ত কোন সংবাদ পৌঁছে, তখন তারা তা প্রচার করে দেয়; যদি তারা তা সোপর্দ করত রাসূলের কাছে কিংবা তাদের কাছে, যারা তাদের মধ্যে ফয়সালার অধিকারী"*** (সূরা নিসা: ৮৩)। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন: ***"তোমাদের মধ্য হতে"***, ভিন্ন শব্দে তোমরা ব্যতিত অন্য কারও মধ্য হতে নয়; এবং "তাদের মধ্য হতে", ভিন্ন শব্দে তারা ছাড়া অন্য কারও মধ্য হতে নয়। এই আয়াতসমূহ নির্দেশ করে যে, কাউকে শাসনের কর্তৃত্ব দেয়ার পূর্বশর্ত হলো- তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে।

বাস্তবতা হচ্ছে যে, কুর'আনে আলাদাভাবে কেবলমাত্র কোন একজন শাসকের কথা বলা হয়নি, বরং যখনই শাসকের বিষয়ে আয়াত এসেছে তখন তার সাথে শাসক হিসেবে মুসলিমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যা নিশ্চিত করে যে মুসলিম হওয়া শাসনের জন্য পূর্বশর্ত। এছাড়াও, মুসলিমদের পক্ষ হতে শাসক পূর্ণ আনুগত্য লাভ করবে এবং মুসলিমদেরকে অবিশ্বাসীদের আনুগত্য না করার জন্য জবাবদিহিতার সম্মুখিন করা হবে না, কারণ শারী'য়াহ্ উৎসের মাধ্যমে কেবলমাত্র মুসলিম শাসকের আনুগত্য করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ফয়সালার অধিকারী"*** (সূরা নিসা: ৫৯), সুতরাং কেবলমাত্র মুসলিম শাসককে আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হয়েছে, অন্য কাউকে নয়, যা নির্দেশ করে যে অবিশ্বাসী শাসকের আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক নয় এবং ইসলামে আনুগত্য ব্যতিত কোন শাসক নেই। এই যুক্তি দেয়া যাবে না যে, একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় ব্যবস্থাপক অবিশ্বাসী হলেও তার আনুগত্য করা মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক। কারণ, এই ধরনের ব্যক্তি শাসক নয়, বরং সে হচ্ছে সরকারী কর্মচারী। সুতরাং তাকে মান্য করতে হবে, কেননা শাসক বিভাগীয় ব্যবস্থাপককে মান্য করার আদেশ প্রদান করে এবং আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে শাসককে মান্য করা,

নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীকে নয়। এ কারনে মুসলিমদের উপর শাসক হিসেবে দায়িত্বে থাকা কারও জন্য সঠিক হবে না, যদিনা সে মুসলিম হয়। এবং অবিশ্বাসী হওয়া তার জন্য সঠিক হবে না, তদনুসারে শাসকের জন্য এটা অবশ্যই অনুমোদিত নয় যে সে একজন অবিশ্বাসী হবে।

শাসক পুরুষ হওয়ার শর্তের বিষয়ে বলা যায় যে, আবু বকর কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের বক্তব্য হতে এটি সুস্পষ্ট: ***"যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অবহিত করা হয়েছিল যে, কিসরার মেয়েকে পার্সিয়ানদের শাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে তখন তিনি (সা.) বলেছিলেন, "কোন জনগোষ্ঠী তাদের শাসক হিসেবে একজন নারীকে নিয়োগ করলে কখনও সফলতা অর্জন করতে পারবে না"*** (আল-বুখারী)। যারা নিজেদের শাসক হিসেবে কোন নারীকে নিযুক্ত করে তাদের অসফল হওয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি কোন নারীর শাসক হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্তির বিষয়টিকে নিষিদ্ধ করে দেয়, কারণ এটি অনুরোধের ধরণ হতে এসেছে। এবং প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে যে এই বিবৃতিটি তিরষ্কার হিসেবে এসেছে, যা নির্দেশ করে যে এর নিষিদ্ধতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত, এবং তদনুসারে একজন নারীকে শাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হারাম (নিষিদ্ধ), এবং এই দলিল হতে শাসনের এই শর্তটি উদ্ভুত হয়েছে।

শাসকের ন্যায়বিচারক হওয়ার শর্তের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সাক্ষী হওয়ার বিষয়ে ন্যায়পরায়নতাকে পূর্বশর্ত হিসেবে ধার্য করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ***"আর তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়বান লোককে সাক্ষী রাখবে"*** (সূরা তালাক: ২), এবং একারনে সাক্ষীর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যেমন: শাসকেরও অবশ্যই বৃহত্তর যুক্তিতে ন্যায়পরায়ন হতে হবে। এর কারণ হল, যদি সাক্ষী হওয়ার জন্য সচ্চরিত্রবান হওয়া পূর্বশর্ত হয় তবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে শাসকের জন্যও অবশ্যই এই শর্তটি প্রযোজ্য হবে।

মুক্ত মানুষ হওয়ার শর্তের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যেহেতু একজন দাসের তার নিজের জন্য স্বাধীনভাবে কোন কাজ করার অধিকার থাকে না সেহেতু সে কিভাবে অন্যান্য মানুষের বিষয়াদি দেখাশোনা করার দায়িত্বভার নিতে পারে। এছাড়াও, দাস হওয়ার মানে হচ্ছে - তার প্রভু তার সময়ের মালিক।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার শর্তের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কোন শিশু শাসক হতে পারবে না, কারণ আলি বিন আবি তালিব (রা:) হতে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, ***"তিন ধরনের ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে: শিশু হতে, যতক্ষন পর্যন্ত না তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়; ঘুমন্ত ব্যক্তি হতে, যতক্ষন পর্যন্ত না তারা জাগ্রত হয়; এবং অপ্রকৃতস্থ (পাগল) ব্যক্তি হতে, যতক্ষন পর্যন্ত না তারা সুস্থ হয়"***, এবং হাদিসটি ভিন্ন শব্দেও এসেছে, ***"তিন ধরনের ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়: বিচারবুদ্ধিহীন পাগল হতে, যতক্ষন পর্যন্ত না সে সুস্থ হয়; ঘুমন্ত ব্যক্তি হতে, যতক্ষন পর্যন্ত না সে জাগ্রত হয়; এবং শিশু হতে, যতক্ষন পর্যন্ত না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়"***, এবং কলম উঠিয়ে নেয়ার অর্থ হচ্ছে, এটা সঠিক নয় যে সে স্বাধীনভাবে তার কাজসমূহ করতে সক্ষম, এবং শারী'য়াহ্ অনুসারে তার জবাবদিহিতা নেই; এবং তদুনসারে এটা সঠিক নয় যে, সে খলিফা কিংবা তার অধীনস্ত শাসন সম্পর্কিত কোন পদে আসিন হতে পারে, কারণ তার স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার থাকে না, কোন শিশুর জন্য খলিফা হওয়ার অনুমতি না থাকার বিষয়ে আরেকটি দলিল রয়েছে যা আল-বুখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে: ***"আবি-আকিল যুহ্‌রা বিন মা'বাদ তার দাদা আব্দুল্লাহ্ বিন হিসাম হতে, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যমানার সমসাময়িক ছিলেন, তার মা জায়নাব বিনতে হামিদ তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে নিয়ে গিয়েছিল এবং বলেছিল: হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তার কাছ থেকে আনুগত্যের বাই'য়াত গ্রহণ করুন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছিলেন যে: সে ছোট, এবং তিনি (সা.) তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন এবং তার জন্য দু'আ করেন"***। অতএব, যদি একজন শিশুর জন্য আনুগত্যের বাই'য়াত প্রয়োজন না হয় এবং শিশুটি যদি খলিফাকে বাই'য়াত দিতে বাধ্য না থাকে তবে বৃহত্তর যুক্তিতে তার জন্য খলিফা হওয়াও অনুমোদিত নয়।

সুস্থমস্তিষ্ক হওয়ার শর্তের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, অপ্রকৃতিস্থ হওয়া তার জন্য সঠিক নয়, কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: ***"তিন ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে"***, যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ***"অপ্রকৃতস্থ বা পাগল যার বিচারবুদ্ধি হারিয়ে গেছে, যতক্ষন পর্যন্ত না সে সুস্থ হয়"***। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে বলতে বুঝানো হয়েছে যে তার জবাবদিহিতা নেই। কারণ, বিচারবুদ্ধি হচ্ছে জবাবদিহিতার কেন্দ্রবিন্দু এবং এটা যেকোন লেনদেনের শুদ্ধতার বিষয়ে পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। খলিফার দায়িত্বসমূহ আইন এবং শারী'য়াহ্ হুকুম বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। এবং, ফলশ্রুতিতে অপ্রকৃতস্থ হওয়া তার জন্য যথার্থ হবে না, কারণ একজন অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তির পক্ষে স্বাধীনভাবে নিজের দায়িত্বসমূহ পালন করা সম্ভব নয়। অতএব, বৃহত্তর যুক্তিরবিচারে এটা প্রমানিত হয় যে, একজন অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তির জন্য জনগণের দায়িত্ব নেয়া সঠিক নয়।

খলিফার অবশ্যই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা থাকতে হবে, এরূপ শর্তের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এটি খলিফাকে প্রদত্ত বাই'য়াত হতে উদ্ভুত কর্তব্যসমূহ এবং খলিফা ব্যতিত শাসনকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী, গভর্ণর ও আমিলদের যে কারও সাথে সম্পাদিত নিয়োগের চুক্তি হতে উদ্ভুত দায়িত্বসমূহ হতে এসেছে। কারণ, একজন অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে নিয়োগের চুক্তি মোতাবেক প্রদত্ত বাই'য়াতের শর্তানুযায়ী কুর'আন ও সুন্নাহ্'র ভিত্তিতে জনগণের বিষয়াদি দেখশোনা করা সম্ভব নয়।

এটার প্রমাণ বিভিন্ন দলিলে পাওয়া যায়:

১. আবু জর হতে মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে তিনি (আবু জর) বলেছেন: ***"আমি বলেছিলাম: হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কি আমাকে নিয়োগ দেবেন না? এরপর তিনি (সা.) আমার কাধে তাঁর (সা.) হাত রাখলেন এবং বল্লেন: "হে আবু জর, তুমি দুর্বল, এবং এটি একটি আমানত (বিশ্বাস), এবং বিচারদিবসে এটা অসম্মান ও অনুতাপের কারণ হবে, তবে তারা ব্যতিত যারা এর হক্ব আদায় করে এবং আরোপিত দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে পালন করে"***।

সুতরাং, এই হাদিসটিতে এর হক্ব আদায় ও এ থেকে উদ্ভুত দায়িত্বসমূহ পালনের বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে; ভিন্ন শব্দে বলা যায় যে, এর জন্য যোগ্য হতে হবে এবং যে ইঙ্গিতটি এখানে চূড়ান্তভাবে প্রমানিত হয়েছে সেটি হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এটা নেয় এবং সে তার যোগ্য নয় তবে - ***"এবং বিচার দিবসে এটা অসম্মান ও অনুতাপের কারণ হবে, তবে তারা ব্যতিত যারা....."***

২. আবু হুরায়রাহ্ হতে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: ***"যদি বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয় এবং অর্পিত দায়িত্বে অবহেলা করা হয় তবে চূড়ান্ত সময় আসার অপেক্ষা কর"। লোকটি বিশ্বাস সম্পর্কে এবং বিশ্বাস কিভাবে নষ্ট বা ভঙ্গ করা হতে পারে সে সম্পর্কে পূনরায় জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বল্লেন: "যখন অযোগ্য কারও উপরে শাসনের দায়িত্বসমূহ বাস্তবায়নের অধিকার ন্যস্ত করা হয় তবে শেষ বিচার দিবসের অপেক্ষা কর"***।

সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনাটি অযোগ্য কারও উপর শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করার চুড়ান্ত নিষেধাজ্ঞার প্রতি নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে নিশ্চিত নির্দেশনাটি (কারিনা) হচ্ছে বিশ্বাসের অমর্যাদা, এবং এর মাধ্যমে শেষ বিচার দিবসের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে; এবং এসকল দলিলের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনে অযোগ্য কারও উপর শাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত করার মতো গুরুতর গুনাহ্'র প্রতি নির্দেশ করা হচ্ছে।

কিভাবে যোগ্যতা নিরূপণ করা উচিত সে সম্পর্কে বলা যায় যে, এর জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন, কারণ এটা শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। তাই এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মাযালিম আদালতের উপরে ছেড়ে দেয়া হয়, যেমন: খলিফা পদপ্রার্থী ব্যক্তি প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসমূহ পূরণ করেছে।